দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

২৬ সেপ্টেম্বর - ২০১১, ৮ আশ্বিন - ১৪১৮ ।। ৬৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

৩৪ বছরের কঙ্কাল

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

অস্তিত্বের সংকটে সিপিএম ❑

দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য, বিদেশীদের স্বীকৃতির পরই সেরাদের চিনি ❑

তিস্তা জলচুক্তি কি মমতাকে ঠেকানোর অস্ত্র হিসেবেই প্রয়োগ করা হলো? ❑ সাধন কুমার পাল **❑**

পাকিস্তানের হয়ে সাফাই গাইছেন কিছু তথাকথিত মুক্তমনা ভারতীয় ❑ এস গুরুমূর্তি **❑**

কঙ্কাল-কান্ডে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আলিমুদ্দিনের নেতারাও রেহাই পাবেন কেন? ❑ বাণীপদ সাহা **❑**

চৌত্রিশ বছরের শব-সাধনা ❑ বাসুদেব পাল **❑**

খোলা চিঠি : মহাকরণে মহালয়া, টেমস নদীতে ভাসান ❑ সুন্দর মৌলিক **❑**

সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত এত অবহেলিত কেন? ❑ ডঃ প্রণব রায় **❑**

ত্রিভাষা ❑

তর্পণে পিতৃপুরুষদের তৃপ্তি ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য **❑**

ইউরোপের দেশে দেশে : ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ❑ হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ **❑**

নিয়মিত বিভাগ :

এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল : ❑

চিঠিপত্র : ❑ নবাঙ্কুর : ❑ কর্মযোগ : ❑ সমাবেশ-সমাচার : ❑

রঙ্গম : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিত্রকথা : ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

চৌত্রিশ বছরের শব-সাধনা
পৃঃ ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৮ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৬ সেপ্টেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

মোদীর সদ্ভাবনা মিশন

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সদ্ভাবনা মিশন' লইয়া জাতীয় রাজনীতি সম্প্রতি তোলপাড় হইয়া গেল। সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট দাঙ্গা সম্বলিত একটি মামলার শুনানিকে গুজরাটেরই নিম্ন আদালতে পাঠাইয়া দেওয়ায় মোদী যথেষ্ট স্বস্তি লাভ করিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্ট মোদীকে 'ক্লিন চিট' দেয় নাই বলিয়া যতই বলা হোক না কেন আদতে এই রায় মোদীর জয়েরই সূচক। কেননা ওই মামলার আবেদনের অন্যতম প্রতিপাদ্যই ছিল যে গুজরাটের মামলার শুনানি গুজরাটের বাহিরে না হইলে সুবিচার পাওয়া যাইবে না। সেই আবেদনে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কর্ণপাত করে নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মামলার সঙ্গেই রহিয়াছে সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীমের তদন্ত রিপোর্টও। সেখানেও কিন্তু বলা হইয়াছে মোদীর বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বস্তুত গোধরা পরবর্তী গুজরাটের দাঙ্গার পর হইতে মোদীকে যতই ভিলেন সাজাইবার চেষ্টা হইয়াছে ততই কিন্তু গুজরাটবাসী তাঁহার উপরই বিশ্বাস রাখিয়াছেন।

এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তির লক্ষ্যে তিনি তিন দিনের অনশন কর্মসূচীর কথা বলিয়াছেন এবং আমেদাবাদের ইউনিভার্সিটি হলে 'সদ্ভাবনা মিশন'-এর মঞ্চ হইতে 'সামাজিক শান্তি, সম্প্রীতি'র কথা বারবার ঘোষণাও করিয়াছেন। অনশন শুরুর আগে দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠিতে গত দশ বছর ধরে যাঁহারা তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া চলিতেছেন তিনি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোনও সম্প্রদায় দুর্বল হইলে যে রাজ্যকে উন্নত বলা যায় না সেই কথাও জানাইয়াছেন। সেইসঙ্গে এই কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে তিনি তোষণের রাজনীতি করেন না। রাজ্যের উন্নয়নই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

ইউপিএ জমানায় যেভাবে দুর্বল নেতৃত্ব, দুর্নীতিই সরকারের প্রধান সমস্যা হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে এবং গোটা দেশে একটা দুর্নীতি-বিরোধী আবহ তৈরি হইয়াছে, সেইসময় আমেরিকার সি আর এস কথিত রিপোর্টে মোদীর প্রশাসন সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে— 'স্ট্রিমলাইনড ইকনমিক প্রসেস এন্ড কার্টেলিং করাপসন'—অর্থাৎ প্রচুর কর্মসংস্থান সহ নিবিড় উন্নয়ন, ১২ শতাংশ আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, সেই অর্থে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রায় না থাকা, গত প্রায় দশ বছর কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হওয়া এবং সর্বোপরি কড়া প্রশাসক হিসেবে মোদীর উপস্থিতি সারা দেশের কাছে গুজরাটকে উন্নয়ন ও দক্ষ প্রশাসনের মডেল হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। যে দেশে ৬৫ শতাংশ নাগরিকের বয়সই ৩৫ বছরের নীচে, গুজরাট মডেল যে তাহাদের কাছে আদর্শ একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুত দুর্নীতি ইস্যুতে মোদীর কঠোর অবস্থান গোটা দেশ গ্রহণ করিলে ভারত এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছাইবে।

অনশনস্থলে লক্ষণীয়ভাবে সর্বধর্ম সমভাবের দৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। বহু মুসলিম, খৃস্টান পরিবার সেখানে হাজির ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুরাও ছিলেন। বিজেপির শীর্ষ নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীরা তো বটেই, এন ডি এ শরিক শিবসেনা ও অকালি দলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। মোদীর এই কর্মসূচীকে সমর্থন জানাইয়া তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাও এক প্রতিনিধি দল পাঠাইয়াছেন। বস্তুত কংগ্রেস সহ যাঁহারা বিরোধিতা করিতেছেন তাহা শুধু রাজনৈতিক কারণেই। ফাইভ স্টার অনশনের নাটক, প্রধানমন্ত্রীত্বই লক্ষ্য ইত্যাদি সমালোচনা অত্যন্ত দুর্বল প্রয়াসেরই নামান্তর। এদেশের জনমানসে তাহা কোনও দাগ কাটিতে পারে নাই। মেজরিটি-মাইনোরিটির ভিত্তিতে নয়, ভোট-রাজনীতির দিকে তাকাইয়া নয়, সমগ্র গুজরাটবাসীই তাঁহার উন্নয়নের লক্ষ্য। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁহার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তির লক্ষ্যে অনশনের এই কর্মসূচী সর্বধর্মসমভাব নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। নরেন্দ্র মোদীর সদ্ভাবনা প্রকৃত অর্থেই সদ্ভাবনা। একে বাঁকা চোখে দেখিবার কোনও কারণ নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে— প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক। যাহাতে গরীবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ভারতকে উঠিতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাওবাদীদের মদতে মিশনারীরা জনজাতিদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করছে

সংবাদদাতা।। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রীতি- রেওয়াজ রক্ষার দাবীতে দেশের ১৪টা রাজ্য থেকে শতাধিক জনজাতির মানুষ গত ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে সমবেত হয়েছিলেন। মাওবাদীদের মদতে খৃস্টান মিশনারীরা কিভাবে জোর করে জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করছে, ন্যাশানাল ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরতেই তাঁদের দিল্লী আসা। ছত্তিশগড়ের যশপুর নগরের অর্চনা ভগত, ওড়িশার খণ্ডমাল জেলার গদাধর প্রধান, গুজরাটের ডাংস জেলার ভৈকাভাই পাওয়ার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের গোলাঘাট থেকে সুনীল, জামদারি রিয়াং প্রমুখ বেশ কয়েকজন জনজাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে ট্রাইব্যুনালের সামনে সাক্ষ্য দেন। উল্লেখ্য, পাঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি কে পি এস গিল, প্রবীণ লেখক ভবদীপ কাং, এয়ারমার্শাল (অব.) বি কে গুপ্তা, প্রাক্তন ভারতীয় দূত প্রভাত শুক্লা প্রমুখ বিশিষ্টজনকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে।

মিশনারীদের হাত কতদূর প্রসারিত তা প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র জামাতিরা বনবাসী জানায় যে খোদ দিল্লীতেই সম্প্রতি তার ১৭ জন সহপাঠী খৃস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। ত্রিপুরা খৃস্টান ফেলো অর্গানাইজেশন অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে এইসব ছাত্রদের ধর্মান্তরিত করেছে। নিখিল নামে জনৈক ছাত্র আরও জানিয়েছে যে হিন্দু জনজাতিদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করার জন্য মিশনারীরা মাওবাদীদের সাহায্য নিয়েছে। মাওবাদী ও মিশনারীদের মধ্যে এ নিয়ে এক অসাধু চক্র ক্রমশই বিস্তারলাভ করছে। মাওবাদীরা এখন নিজেদের আধিপত্যের এলাকায় খৃস্টান মাওবাদীদের নিযুক্ত করছে। উল্লেখ্য, ওড়িশায় হিন্দু মাওবাদী ও খৃস্টান মাওবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষের কথা ইতিমধ্যেই স্বস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের গোলাঘাটের সুনীল জানায় যে সে ৫০০ টাকার বিনিময়ে খৃস্টান হয়েছিল এবং যখন সে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসে তখন তাঁকে সুদসহ সেই টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছিল। জামদারি রিয়াং জানায় খৃস্টান হতে রাজী না হওয়ায় তাকে তার পরিবারসহ মিজোরাম ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। ইম্ফলের পাশিং গোলমাই জানায় যে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল খৃস্টান হলে একটি সুন্দরী কর্মরতা খৃস্টান মহিলাকে বিয়ে করার সুযোগ পাবে। সে অবশ্য এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে।

সে আরও জানায়, তাদের এলাকার ৬৪টি গ্রাম মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়ার মুখোমুখি। এই অঞ্চলে হিন্দুদের নিজস্ব পরিচিতি ও ঐতিহ্য সংকটের মুখে।

ধর্মান্তরকরণে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত জনজাতি মানুষের কাছ থেকে সরাসরি বক্তব্য শুনে ট্রাইব্যুনাল বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন। পরবর্তী পদক্ষেপ তাঁরা কি গ্রহণ করেন এখন সেটাই দেখার।

প্রশ্নচিহ্নের মুখে মাও-মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাও মোকাবিলায় বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র। আগামী তিন বছরে ৯টি রাজ্যে ৬০টি নকশাল-অধ্যুষিত এলাকায়। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৩৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এর মধ্যে ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে স্রেফ ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষের জন্য। এই বরাদ্দে রাস্তা নির্মাণ ও সংযোগকারী পথ নির্মিত হবে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর মাওবাদের মোকাবিলায় কৌশলগত সমীক্ষা নিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে কেন্দ্রের এক বৈঠকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এও ঘোষণা করে যে জেলাস্তরে প্রশাসনের সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের কাজে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট-এর মতো অগ্রণী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মেধাও যুক্ত করা হবে। এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে বাম-ঘরানার চরমপন্থাকে মুঠোয় আনতে ওই জেলাগুলোর তিন লক্ষ স্থানীয় যুবককে চাকরি দেবারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কেন্দ্রের তরফে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, নির্ধারিত ওই ৬০টি বনবাসী অধ্যুষিত এবং অনগ্রসর জেলায় ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যানের (আই এ পি) আওতায় অধিক খরচের সুবিধে রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়মাবলী (পপুলেশন নর্মস) শিথিল করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনায় বর্তমান নিয়মানুযায়ী ২৫০-এর বেশি জনবসতি এলাকায় গ্রাম সড়ক যোজনার কাজ হবে।

কিন্তু নিয়ম শিথিল করে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, আড়াইশো বা তার অধিক জনসংখ্যার জনবসতি এলাকায় সড়ক নির্মাণের জন্য আগামী ৩ বছরে ১৫,৩০০ কোটি টাকা এবং ১০০ থেকে ২৪৯ জনসংখ্যার জনবসতি এলাকায় সড়ক নির্মাণের জন্য ১৯,৩৪০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

কেন্দ্রের এই উদ্যোগ যে মাও দমনে সদর্থক ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে বিশেষ দ্বিমত না থাকলেও এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তা নির্মাণ প্রশাসনকে যেমন দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে, তেমনি একথাও ঠিক যে বহু দুর্গম স্থানকে গ্রাম-সড়ক যোজনায় আনা একান্তই অসম্ভব। সেক্ষেত্রে মাওবাদীরা তাদের ওপর পুলিশি হানার প্রতিশোধ নিতে যে সেই দুর্গম স্থানকে ব্যবহার করতে পারে, এই সম্ভাবনা কিন্তু কোনওভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, শুধু সড়ক নির্মাণের ওপর-ই কেন্দ্র জোর দিচ্ছে। তিন লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থানের কথা বললেও সে নিয়ে পরিকল্পনা নেই। এছাড়া সেখানকার মানুষের সামগ্রিক রোজগারের বিষয়ে কেন্দ্র কোনও উচ্চ-বাচ্য করেনি। সুতরাং যে সীমাহীন দারিদ্র্যের সুযোগ মাওবাদীরা নিয়েছিল তার বিকল্প পথের সন্ধান দিতে এখনও অবধি কেন্দ্র তাদের অপারগতাই দেখিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ওঠা মারাত্মক সব আর্থিক দুর্নীতি'র অভিযোগ, মাও মোকাবিলায় বরাদ্দ এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সদ্ব্যবহার যে সঠিকভাবে হবে তার গ্যারান্টি কোথায়? বরং সেখানেও আর্থিক দুর্নীতি হলে মাওবাদীরা সেই সুযোগের ব্যবহার করে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

ভারতের কালো তালিকাভুক্ত অস্ত্র বিক্রেতাদের মদত দিচ্ছে চীন-পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশের নিরাপত্তার আকাশে হঠাৎই কালো মেঘ। সেনাবাহিনী-র বন্দুক পদ্ধতির পারফরম্যান্স আচমকাই পড়তির দিকে। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল অস্ত্র বিক্রেতাদের অনেককেই কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাই কারিগরী বিনিময়ের মান কমে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর সরকার এ নিয়ে বৃহত্তর নীতি-সমীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উদ্বেগের মুহূর্ত তৈরি হয় যখন নবম রেজিমেন্টের জওয়ানরা উচ্চ প্রযুক্তির ১৩০ এম এম বন্দুক থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গুলি ছোঁড়েন। সাধারণভাবে এতে যে রেঞ্জ প্রত্যাশা করা হয়, তার থেকে ১৫ কিমি কম রেঞ্জ নজরে আসে পর্যবেক্ষকদের। পরীক্ষা করে জানা যায়— 'বায়োমডিউলার চার্জ সিস্টেমে'র অনুপস্থিতিই কমিয়ে দিয়েছে উন্নত-প্রযুক্তির ১৩০ এম এম বন্দুকটির রেঞ্জ। ইজরায়েলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকান দু'টি কোম্পানীর সঙ্গে ভারতের কোলাবরেশনে 'বায়োমলিকিউলার চার্জ সিস্টেম'টি তৈরি হোত, কিন্তু এটি আপাতত কালো তালিকাভুক্ত। এর অনুপস্থিতি'র জন্য কমপক্ষে ৪০০টি বোফর্স কামান-কেও উন্নতমানের করা যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানিয়েছে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এন এস জি)-এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত একটি কমিটির হাতে এনিয়ে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে তারা খতিয়ে দেখবে শাস্তিপ্রাপ্ত অস্ত্র-বিক্রেতাদের কোন পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হতে পারে। ওই অস্ত্র-বিক্রেতারা প্রতিহিংসার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণার কথাও ভাবা হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য 'আপগ্রেডেশানে'র জন্য ১৩০ এম এম বন্দুকে নতুন ১৫৫ মিমি ব্যারেল প্রতিস্থাপন আবশ্যক। এর ফলে সমতলে সেই ১৩০ এম এম বন্দুকের রেঞ্জ ২৭ কিমি থেকে বেড়ে ৩৯ কিমি হবে। আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বিস্ফোরক নিক্ষেপের জন্য আধুনিক পৃথিবীতে 'বায়োমডিকিউলার চার্জ সিস্টেমে'র অপরিহার্যতা সন্দেহাতীত। এই 'বায়োমডিউলার চার্জ সিস্টেম' বোফর্স কামানের রেঞ্জ ৩০-৩৫ কিমি থেকে বাড়িয়ে ৪৫-৪৮ কিমি করে দিতে পারে। তবে এ ব্যাপারে চীনের ভূমিকা ভারতের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। চীন সেই সমস্ত অস্ত্র-বিক্রেতাদের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে, যাদেরকে ইতিমধ্যেই ভারত কালো-তালিকাভুক্ত করে ফেলেছে। চীনের এন ও আর আই এন সি ও জানিয়েছে উন্নতমানের ১৫৫ এম এম বন্দুক তৈরি করতে দক্ষিণ আফ্রিকার ডিনিলের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছে। চীনের পাশাপাশি এ নিয়ে ভারত বিরোধিতার সুযোগ-সন্ধানে নেমে পড়েছে পাকিস্তানও। পাকিস্তান বন্দুক ছাড়াও মিসাইলের কথা বলেছেদক্ষিণ আফ্রিকান কোম্পানীটির সঙ্গে। আমাদের দেশের পক্ষে উদ্বেগজনক হলো প্রায় ১০ বছর পর ইজরায়েলের সঙ্গে সেনা-চুক্তি করতে চীন এখন সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশভাগের পুরনো কৌশল

মুসলমানদের জন্য নির্বাচনী কোটা'র দাবি রেজ্জাকের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রগতিবাদের তকমা লাগিয়ে নিজেদের নামের আগে 'কমরেড' শব্দটা জুড়ে দিয়ে যারা রাজনীতি করছেন তাদের অবচেতন মন যে এখনও ধর্মের ভিত্তিতে দাবি আদায়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি সমর্থন করে, সম্প্রতি রেজ্জাক মোল্লার বাঙালী মুসলমান তাস খেলায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য— 'নির্বাচনে মুসলমানদের কোটা থাকা দরকার। আমি বাঙালী মুসলমানদের কথাই বলছি। কারণ তাদের বড় অংশই চাষবাস করে। তারা নানাভাবে বঞ্চিত। একশো বছর ধরে চলছে একই রকম বঞ্চনার পর্ব।'

রেজ্জাক ফিরে গেছেন ১৯০৯ সালের ইতিহাসে। সেই সময় হয়েছিল 'মর্লে-মিন্টো সংস্কার'। যাতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছিল। রেজ্জাক মোল্লা ২ কোটি ১৪ লক্ষ পেছিয়ে থাকা বাঙালী মুসলমানের জন্য নির্বাচনী সংরক্ষণ দাবী করেছেন। তাঁর যুক্তি, তাঁর দল সিপিএম স্বীকার করে বাঙালী মুসলমানদের একটা বড় অংশই পেছিয়ে রয়েছে। তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু আছে। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য নয় কেন? বস্তুত রেজ্জাক মোল্লা যা দাবী করেছেন তা স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের মুসলীম লীগ এবং বর্তমান ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল-এর প্রতিধ্বনি।

মুসলমানদের দাবিদাওয়ার সঙ্গে ধর্মকে মেশাচ্ছেন কেন— এই প্রশ্নের জবাবে তাঁর কথা— তিনি মুসলমানদের জন্য সামাজিক সুবিধা চান। বাঙালি মুসলমানরা নানাদিক থেকে পেছিয়ে আছে। তাদের জন্য বিশেষ রাজনৈতিক শক্তি দরকার। সেজন্য চাই নির্বাচনী সংরক্ষণ। মোল্লা সাহেবের কথা শুনে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বক্তব্য, এতো নতুন বোতলে পুরনো মদ। দেশ ভাগের সেই পুরনো ছক।

শোকসংবাদ

হাওড়া মহানগরের বিশিষ্ট কার্যকর্তা বর্তমানে কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাঞ্চন ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য স্বল্প রোগভোগের পর গত ৪ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি দুই কন্যা, এক পুত্র, দুই জামাতা, এক পুত্রবধূ, তিন নাতনী ও দুই নাতি রেখে গেছেন। তাঁর স্বামী প্রয়াত গোবিন্দ ভট্টাচার্যও হাওড়া জেলায় সঙ্ঘের অত্যন্ত কর্মঠ কার্যকর্তা ছিলেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩ অক্টোবর ২০১১ (সোমবার) থেকে ১১ অক্টোবর ২০১১ (মঙ্গলবার) অবধি শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে "স্বস্তিকা"র সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। এজন্য ১০ এবং ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ২৪ অক্টোবর থেকে স্বস্তিকা যথারীতি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। স্বস্তিকা'র সকল বিভাগের কাজ পূজাবকাশের পর অর্থাৎ ১২ অক্টোবর, ২০১১ (বুধবার) থেকে শুরু হবে।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

অস্তিত্বের সংকটে সিপিএম

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতিতে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যের সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা যাচ্ছে। সিপিএমের মধ্যে একদিকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে সিপিএমের রাজত্বের দুর্নীতির ঘটনা একটার পর একটা বেরিয়ে পড়ছে। সেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। সিপিএমের রাজ্য-নেতৃত্ব তখন থেকেই আসন্ন সম্মেলনে যাতে কোনও ভোটাভুটি না হয় সে সম্পর্কে 'সাংগঠনিক' ব্যবস্থা নিচ্ছে। এদিকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে নতুন সমীকরণ দেখা যাচ্ছে। এই সমীকরণে গৌতম দেব-কেই রাজ্য-সম্পাদক হিসাবে সামনে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। পার্টির মুখপাত্র হিসাবে মহম্মদ সেলিমকে রাখার ব্যাপারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চাপের কাছে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলী নতি স্বীকার করেছে। এদিকে বিমান বসু বিভিন্ন জেলায় নিজের আসন বজায় রাখার 'সংগ্রামে' ব্যস্ত। রাজ্য- সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব সুশান্ত ঘোষকে 'বাপের বেটা' বলে প্রশংসা করেছে। বুদ্ধবাবু বরাবরই সুশান্ত বিরোধী। বুদ্ধদেববাবু দীপক সরকারকেও কোণঠাসা করতে চান।

কৃষক ফ্রন্টে রেজ্জাক মোল্লাকে কব্জে দিতে নারাজ রাজ্য-নেতৃত্ব। সেই কারণে বামপন্থী কৃষক সংগঠনের যৌথ সভায় রেজ্জাক মোল্লাকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ এবং বিনয় কোঙারই প্রধান বক্তা ছিলেন। পার্টির বর্ধমানগোষ্ঠী সংগঠিত হচ্ছেন রাজ্য-পার্টির নেতৃত্বে বসার জন্য।

বর্ধমান গোষ্ঠীতে নিরুপম সেন আগের মতো আর গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে নিরুপম সেন বুদ্ধবাবুর 'ঔদ্ধত্যের' কথা সর্বত্রই বলছেন। তিনি বলছেন, বুদ্ধবাবুর জন্যই আজ পার্টিকে এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে। বুদ্ধবাবু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম- জঙ্গলমহল নিয়ে কোনওদিনই পূর্বাহ্নে পার্টিতে আলোচনার ব্যবস্থা করেননি। অসুবিধায় পড়ে শুধু রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে বলেছেন। রাজ্য-কমিটিকে কার্যত এড়িয়ে গেছেন। ঠিক এই অবস্থায় গৌতম দেবকে তখন বলতে দেখা গেছে— 'আমি তো এখনও রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। আমাকেও কোনও বিষয় জানানো হচ্ছে না।'

রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে তদারকির ভার দেওয়া হয়েছে সিটুর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যসভার সদস্য তপন সেন-কে। বিমান বসু যতই বলুন তরুণদের নেতৃত্বে আনতে হবে, যতদিন বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-বিনয়-শ্যামলেরা দলের নেতৃত্বে থাকবেন, ততদিন নবীন কর্মীরা নেতৃত্বে আসবেন না। রবীন দেবকে নিয়েও বালিগঞ্জ তথা কলকাতা জেলা কমিটিতে বিরোধ আছে। স্মর্তব্য, এক জেলা সম্মেলনে রবীন দেবকে বাদ দিয়েই কলকাতা জেলা কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

সিপিএম পরিচালিত বিগত মন্ত্রিসভার প্রায় সকল দপ্তরেই দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি দমকল বিভাগের দুর্নীতির একটি ঘটনা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। অভিযোগ হলো— ৪০০টি পদের জন্য ৬৫০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগের পরীক্ষায় যাঁরা প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়নি। তাঁরা নাকি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।

বর্ধমান গোষ্ঠীতে নিরুপম সেন আগের মতো আর গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে নিরুপম সেন বুদ্ধবাবুর 'ঔদ্ধত্যের' কথা সর্বত্রই বলছেন। তিনি বলছেন, বুদ্ধবাবুর জন্যই আজ পার্টিকে এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

এই অভিযোগকারীগণ 'গোপাল ভট্টাচার্য' নামে এক অফিসার সম্বন্ধেও অভিযোগ করছেন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত। ওয়াকফ কেলেঙ্কারী তো একটি স্থায়ী দুর্নীতির পাহাড় হয়ে আছে। তিন দশক ধরে বামফ্রন্ট শাসনের নামে অপশাসন করে গেছে। তার ফলও পেয়েছে। এই কলঙ্ক কতদিনে অপসারণ করতে সক্ষম হবে তার কোনও হিসেব-নিকেশ নেই।

অপরদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকারের তিনমাস কেটেছে। এরমধ্যে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে— তা' হলো তিস্তাচুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মতদ্বৈধতা, খাদ্যসুরক্ষা আইন নিয়ে রাজ্য- কেন্দ্র দ্বন্দ্ব। মাওবাদীদের 'নৃশংস' বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে জঙ্গলমহলে ঘাঁটি করে মাওবাদীরা আবার পুরানো কৌশলে রাস্তাকাটা, গাছ ফেলে অবরোধ করার কাজে নেমে পড়েছে। মাওবাদীরা বিভিন্ন কমিটি বা সমিতির নামে লোক জমায়েত ও জনসভা করছে। এইসব জনসভায় প্রায় দশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশের চাকরি দেওয়ার ঘোষণা সম্পর্কে মাওবাদীরা হুমকি দিয়ে বলেছে— 'কেউ এই চাকরি নিলে শাস্তি পাবে'।

মাওবাদীদের ভয়ে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী সুকুমার হাঁসদার বাড়িতে বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব বস্তুত মাওবাদীরা বাতিল করে দিয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার বার্লের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়েও মাওবাদীরা তীব্র সমালোচনা করছে। উল্লেখ্য, এই পিটার বার্লে যখন কলকাতায় মার্কিন কনসাল হিসাবে কাজ করতেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ ওঠে। ফলে পিটার বার্লেকে সরিয়ে নেয় মার্কিন বিদেশ দপ্তর। পিটার বার্লে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন। এও শোনা গেছলো দক্ষিণ কলকাতার এক বিদ্যালয়ের মালিকদের বাড়িতে পিটার বার্লে নাকি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সামনে আরও সমস্যা আসবে জমিনীতি নিয়ে। জমি কেনার অধিকার শিল্পোদ্যোগীদের হাতে দেওয়া হলে এক গুরুতর সমস্যা হবে। জমি অধিগ্রহণ করা হলে ক্ষতিপূরণ ছাড়াও চাকরির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বর্তমান মন্ত্রিসভা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বাদ দিয়ে সরাসরি নিয়োগ করতে চলেছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ভূমিকাও কি এতে স্তব্ধ করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে না? লক্ষ লক্ষ বেকারের নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্তি আছে। তাঁদের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে?

মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের আশ্বাস দিলেও তাঁর দলের এক নেতা সামসুজ্জামান গার্ডেনরিচে একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে হুমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন। এই শিপবিল্ডার্স সংস্থা সমুদ্রযানের নক্শা তৈরির কাজে নিয়োজিত। এ কাজ সুষ্ঠু হলে সমুদ্র বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে।

দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য, বিদেশীদের স্বীকৃতির পরই সেরাদের চিনি

গূঢ়পুরুষের

কলম

নরেন্দ্র মোদী মানেই বিতর্ক। নরেন্দ্র মোদী যদি বলেন জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি দেশের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর তবে তার কদর্য করা হয়। নরেন্দ্র মোদী যদি সদ্ভাবনা ব্রত পালনে অনশন করেন তবে তার ব্যাখ্যা করা হয় 'ফাইভ স্টার অনশন নাটক' বলে। অর্থাৎ, যেভাবেই হোক প্রমাণ করতে হবে যে নরেন্দ্র মোদী খুব খারাপ লোক। হ্যাঁ, দেশের ইংরাজি সংবাদমাধ্যম এবং কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রগুলি একযোগে গত প্রায় ৯ বছর টানা মোদী বিরোধী কুৎসা রটনা করে চলেছে। কারণ, নরেন্দ্র মোদী ভারতে বিদেশী অর্থপুষ্ট ইংরাজি সংবাদমাধ্যমকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেন না। মাথায় তুলে নাচেন না। মার্কিন সরকার ২০০৫ সালে যখন নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে তখন ভারতের ইংরাজি সংবাদমাধ্যম যেভাবে উল্লসিত হয়েছিল অতীতে তার দ্বিতীয় নজির নেই। অনেকেরই হয়তো মনে নেই যে আমেরিকার 'কংগ্রেস্যানাল রিসার্চ সার্ভিসের' রিপোর্টের ভিত্তিতে মার্কিন সরকার নরেন্দ্র মোদীর ভিসা বাতিল করেছিল। আমেরিকার এই সরকারি গবেষণামূলক সংস্থাটির কাজ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন করা। সেই মূল্যায়নের প্রতিবেদন মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, আমেরিকার পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি নির্ধারণে মার্কিন কংগ্রেস বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার এই কংগ্রেস্যানাল রিসার্চ সার্ভিস, সংক্ষেপে সি আর এস, একটি ৯০ পাতার প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের 'সেরা মুখ্যমন্ত্রী'। হি ইজ অ্যা মডেল চিফ মিনিস্টার ইন ইন্ডিয়া। কেন নরেন্দ্র মোদী দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে ভারতে একমাত্র গুজরাটে সরকারি দফতরে ঘুষ দিতে হয় না। প্রশাসনের তলার সারি থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। সি আর এসের প্রতিবেদনে সোজা সরল ভাষায় বলা হয়েছে, 'গুজরাট গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ টোটালি ফ্রি অফ করাপ্সন'। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে আন্না হাজারে সরকারি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে অনশন সত্যাগ্রহ করেছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিনা প্রচারে, নীরবে রাজ্যের সরকারি প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত করেছেন আন্নার অনশনের কয়েক বছর আগেই। আমরা তার খবরই রাখিনি। মার্কিন দেশের সরকারি গবেষণা সংস্থা, 'সি আর এস' তার দেশের জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের অঙ্গরাজ্য গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজ্যে ''স্ট্রিমলাইনড ইকনমি, রিমুভড রেড টেপ, এন্ডেড করাপসন এন্ড বিল্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার''। হ্যাঁ, এরপরেও ভারতের সংবাদমাধ্যম লাগাতার মোদী বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। মোদী জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বললে দেশের বিজ্ঞ সাংবাদিকরা তাকে নাটুকেপনা বলে বিদ্রুপ করছে। দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ করে প্রমাণ করার চেষ্টা

নরেন্দ্র মোদী ভারতের সেরা মুখ্যমন্ত্রী

চলেছে নরেন্দ্র মোদী হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতা। আমি ভারতের কোনও একটি টিভি চ্যানেলে এবং জাতীয় স্তরের সংবাদপত্রে গুজরাটের নবোত্থানের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে প্রশংসা করতে দেখিনি বা পড়িনি। বিগত ৯ বছরে গুজরাটের সর্বত্র যে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রয়েছে তার জন্য দেশের তথাকথিত 'নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম' একটি বাক্যও খরচ করেনি। অথচ সঠিক তথ্য তুলে ধরাই সংবাদমাধ্যমের প্রধান কর্তব্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতের সত্য সংবাদের জন্য আমাদের বৃটেন, আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের উপর নির্ভর করতে হয়। একদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য প্রতিভা আমরা জেনেছিলাম তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করার পরে। চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে চিনতে পেরেছিলাম বিদেশে পথের পাঁচালি পুরস্কৃত হওয়ার পরেই। তেমনি, নরেন্দ্র মোদী যে ভারতের সেরা মুখ্যমন্ত্রী জানতে হয় মার্কিন বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে।

বিশ্বের সেরা সংবাদপত্র, 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি একটি বিশেষ প্রতিবেদনে প্রশাসক হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিল, ''পারহ্যাপস্ ইন্ডিয়ান বেস্ট এগ্জাম্পল্ অফ ইফেকটিভ গভর্নেন্স ইজ ফাউন্ড ইন গুজরাট হোয়ার সি এম নরেন্দ্র মোদী হ্যাজ স্ট্রিমলাইনড ইকনমিক প্রসেস এন্ড কার্টেলিং করাপসন''। অবাক হতে হয় যখন দেখি সত্যকে আড়াল করতে সংবাদমাধ্যম মোদী বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেয়। যেমন, মার্কিন গবেষণা সংস্থা সি আর এস মোদীকে ভারতের সেরা মুখ্যমন্ত্রী বলায় সি পি এম সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরির বক্রোক্তি, ''বিজেপি এখন আমেরিকার সার্টিফিকেট পেয়ে উল্লসিত। অথচ একদিন এই বিজেপিই মোদীকে মার্কিন ভিসা না দেওয়ায় আমেরিকার মুণ্ডপাত করেছে...।'' হ্যাঁ ইয়েচুরিদের এইসব প্রলাপই খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

পানেট্টার হুঁশিয়ারি

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লিওন পানেট্টা সরাসরি পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আমেরিকা তার আফগানিস্তানে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে পাক-কেন্দ্রিক জঙ্গিহানার হাত থেকে বাঁচাতে সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপই নিতে পারে অদূর ভবিষ্যতে। সম্প্রতি কাবুলে মার্কিন দূতাবাসে জঙ্গিহানা এবং আফগানিস্তানে একটি ট্রাক-বিস্ফোরণে ৭৭ জন মার্কিন সেনা গুরুতর আহত হন। পাক-তালিবানেরা এই হামলার পেছনে রয়েছে বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র রিপোর্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতেই পানেট্টার এহেন হুঁশিয়ারি বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

আল কায়েদা প্রধান নিহত

শিরোনাম দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেন বেশ কিছুদিন আগে নিহত হলেও পাক-পৃষ্ঠপোষকতায় আল কায়দা এখনও বহাল তবিয়তে। তবে মার্কিন হানাদারিতে লাদেনের পর আবারও একটা বড়-সড় ক্ষতির মুখে পড়ল আল কায়েদা। এই মাসের মাঝের সপ্তাহের প্রথম দিকে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে আল কায়েদার পাকিস্তান অপারেশনস গ্রুপের প্রধান আবু হাফস আল শাহিরি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মার্কিন সেনাবাহিনী'র সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মারা যায় বলে মার্কিন প্রশাসনের দাবী।

ভারতীয় কূটনীতিতে ব্যাকফুটে চীন

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের 'বিতর্কিত সার্বভৌমত্বে'র দাবি উড়িয়ে 'নৌ- চালনে স্বাধীনতা'র দাবিকে সমর্থন করল ভারত। প্রসঙ্গত ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ও এন জি সি, বিদেশ শাখার দক্ষিণ চীন সাগরে তৈলকূপ খননের মাধ্যমে তেল-উৎপাদনে প্রয়াসী হয়। চীন এর প্রতিবাদে জানায়, দক্ষিণ চীন সাগরের যে অঞ্চলে ভারতীয় সংস্থা তৈলকূপ খনন করতে চলেছে তা আদতে ভিয়েতনাম সরকারের এলাকা এবং সরকারি অনুমতি ছাড়া তারা একাজ করতে পারে না। ভারত সটান জানিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ চীন সাগরে সার্বভৌমত্বের বিতর্ক-কে সম্মান জানাতেই ২০০২-এর ঘোষণা অনুযায়ী ওখানে নৌ-চালনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া

উচিত। ভারতের কূটনীতির কাছে এখন ব্যাকফুটে চীন।

জঙ্গি নিশানায় লাক্সারি বাস

সম্প্রতি গোয়েন্দা দপ্তর থেকে পাঠানো একটি বার্তায় মহারাষ্ট্র পুলিশকে সতর্ক করে বলা হয়েছে মুম্বাই থেকে আমেদাবাদে চলাচলকারী বিলাসবহুল (লাক্সারি) বাসে হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। গোয়েন্দা দপ্তর থেকে এই রিপোর্ট আসার পরেই রাতের ট্রাফিক ব্যবস্থাসহ নিরাপত্তার সমস্ত আয়োজনকেই আঁটো-সাঁটো করতে উদ্যোগী হয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, মুম্বাই থেকে আমেদাবাদ যাওয়ার বাসরুটটি খুবই নির্জন এবং প্রয়োজনের তুলনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানে নেহাত-ই অপ্রতুল। মূলত সে কারণেই তাদের 'সফট টার্গেট' হিসেবে বহু পয়সাওয়ালা মানুষের যান লাক্সারী বাসকেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু হিসেবে বেছে নিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা।

ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ প্রয়াস

কংগ্রেসী আমলে শাসক দলের চামচাগিরির অভিযোগ থেকে সিবিআইকে মুক্তি দিতে সক্রিয় হলেন সিবিআই-এরই প্রাক্তন ডিরেক্টর যোগীন্দর সিং, তাঁর নিজের লেখা বই 'টু জি এবং সিবিআই'-এর মাধ্যমে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর একটি আলোচনা চক্রে শ্রী সিং তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাই যে তাঁকে বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে একথা জানিয়ে বলেন, ''জনসাধারণ সর্বদাই সিবিআই-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। কিন্তু চলতি দুর্নীতি'র সিরিজে সিবিআই তার সক্ষমতা দেখিয়েছে। এমন একটা ঘটনাও দেখাতে পারবেন না যেখানে সিবিআই অসাধারণ কাজ করেনি। একইভাবে কমনওয়েলথ গেমস থেকে শুরু করে আদর্শ হাউসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি সবক্ষেত্রেই সিবিআই একই কাজ করেছে।'' নিন্দুকেরা বলছেন, নিজের কর্মক্ষেত্রের প্রতি অতিরিক্ত মোহ-বশেই অতিশয়োক্তি করে ফেলেছেন যোগীন্দর সিং।

অসন্তুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

বে-আইনী ধর্মীয় কাঠামো ভাঙতে রাজ্য সরকারগুলো গড়িমসি করায় বেজায় ক্ষুব্ধ হলো সুপ্রিম কোর্ট। অননুমোদিত ধর্মীয় কাঠামো সরিয়ে দেবার ব্যাপারে ২০০৯-এর ২৯ সেপ্টেম্বর দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় নির্দেশ দিলেও গত দু'বছর ধরে সেই কাজ হয়নি কেন? —এই প্রশ্নই তোলেন বিচারপতি দলবীর ভাণ্ডারী ও দীপক ভার্মার ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতিদের আঙুল মূলত, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও দিল্লী সরকারের দিকে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছে, ওই চারটি রাজ্যেই রাজ্য সরকার হাতে গোনা কয়েকটি মন্দিরকে বে-আইনী ধর্মীয় কাঠামোর অভিযোগে উচ্ছেদ করলেও অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা বিপুল সংখ্যক মসজিদ এবং গীর্জাগুলোর গায়ে আঁচড়টুকু কাটার সাহস দেখাতে পারেনি, স্রেফ সংখ্যালঘু ভোট-ব্যাঙ্কের ভয়ে।

তিস্তা জলচুক্তি কি মমতাকে ঠেকানোর অস্ত্র হিসেবেই প্রয়োগ করা হলো ?

সাধন কুমার পাল

ঢাকার সঙ্গে তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি না হওয়ার জন্য দু'দেশেই নানা রকম গরমাগরম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ঝড় বয়ে গেল। এখন ক্রমেই পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসছে। তৃণমূল শরিকি সম্পর্কে এই ঘটনার রেশ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই শক্তপোক্ত হয়ে উঠছে। এই ভাবনাও ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে যে অনাগত ভবিষ্যতের কোনও আশঙ্কা থেকে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের এই চুক্তি নিয়ে ছেলেখেলা করা হয়নি তো? দেশের চলমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আজ এই ভাবনাটিও আলোচিত হওয়া দরকার।

সরাসরি এই প্রসঙ্গে আসার আগে তিস্তার জলবণ্টন ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমে যে সমস্ত আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে তার মুখ্য অংশগুলিতে একবার চোখ রাখা দরকার। এ রাজ্যের সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া স্পষ্টতই এই চুক্তি করতে না পারার দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়েছে। এ জন্য যে সমস্ত তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করা রয়েছে সেগুলোও যথেষ্ট মজবুত ও অকাট্য।

যেমন বলা হয়েছে, (১) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একরকম অন্ধকারে রেখেই এই চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ জল ছাড়ার কথা ছিল তাতে উত্তরবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠত। ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ত কৃষিতে। সুতরাং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এর প্রতিবাদ না করে মমতার উপায় ছিল না। (২) বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার দোহাই দিয়ে তিস্তার জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা না করে কেন্দ্রের শাসকরা যে ঔদ্ধত্য ও উপেক্ষাপূর্ণ আচরণ করেছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী এই ঘটনার প্রতিবাদ হওয়া দরকার ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনমোহন সিং-এর সফর সঙ্গী হতে অস্বীকার করে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। (৩) জলবণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কতটা জলের দাবি রয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে তিস্তা গিয়েছে সেই দুই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের কতটা জলের চাহিদা, এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন কি আছে, এই সংক্রান্ত যাবতীয় আলাপ আলোচনা মধ্যস্থতা কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদেশমন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আমলাদের দিয়ে দৌত্য করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। (৪) জল একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তাছাড়া তিস্তা জল চুক্তি যে বাংলাদেশের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটাও সর্বজনবিদিত ব্যাপার। এরকম একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে যতটা সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল ইউ পি এ সরকারের ম্যানেজাররা সেটা করেনি। অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার জন্য আপাতত তিস্তার জল বণ্টন চুক্তি হচ্ছে না এটা আগে থেকে জানিয়ে দিলে ডঃ মনমোহন সিং-এর বহুচর্চিত ঐতিহাসিক সফরের সময় বাংলাদেশিরা অন্তত এ ব্যাপারে আশায় বুক বাঁধতো না। স্বাভাবিকভাবেই শেষ মুহূর্তে প্রত্যাশা ভঙ্গজনিত তিক্ততা সৃষ্টি হোত না। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তিনবিঘা করিডর খুলে দেওয়া, ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়ে দেশের অর্থভাণ্ডারের ক্ষতি স্বীকার করে শুল্কমুক্ত ৪৬টি বাংলাদেশি পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া, নেপাল-ভুটান থেকে পণ্য পরিবহণের জন্য সড়কপথে ট্রানজিট দেওয়ার মতো যে সমস্ত চুক্তি হয়েছে সেগুলি প্রচারের আলোয় আসত এবং ওই দেশের জনমানসে ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়ত।

চারটি বিন্দুর আকারে এখানে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হলো এগুলির কোনটাই যে কোনও ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং এর প্রত্যেকটিই বিশেষত জলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে একটি অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রশ্ন হচ্ছে এবার বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা জলচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক পন্থা পদ্ধতি

কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে যদি সত্যিসত্যিই মমতা ব্যানার্জীর উপর তিস্তার জল চুক্তির অস্ত্র প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করা হয়ে থাকে তা হলে বলতে হবে তারা একাজে আপাতত একশ ভাগ সফল। কারণ বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে মমতা ব্যানার্জী রাতারাতি মমতা-আপা থেকে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ভারতীয় নেত্রী হয়ে উঠেছেন। সে দেশে ভারত-বন্ধু বলে পরিচিত মুখগুলিও মমতার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

অবলম্বন করা হলো না কেন? বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা জলচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় দিনের পর দিন রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করানো হয়েছে। এই দৃশ্য কাছে থেকে দেখেছেন বা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন এমন কিছু প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা এবং উচ্চপদস্থ আমলা এবারের তিস্তা জলচুক্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে রাজ্যকে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত বিষয় অবগত করানোর ঐতিহ্য কেন ভাঙ্গা হলো? এই প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। (১) এটি কেন্দ্রের তরফে অনবধানবশত ঘটে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। সন্দেহ নেই এই ধরনের ঘটনাকে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলা হলে তা হবে একেবারেই দুর্বল যুক্তির একটি প্রতিক্রিয়া। বাস্তবতার কষ্টিপাথরে কোনও অজুহাতেই একে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

(২) ঢাকার সঙ্গে তিস্তা জলচুক্তি হতে না দিয়ে তার সমস্ত দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চাপানোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই বক্তব্যটি উদ্ভট মনে হলেও এরকম বিশ্লেষণের পিছনে শক্তিগ্রাহ্য যুক্তি আছে। কারণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আমআদমির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদী হামলা, আন্না হাজারের আন্দোলনের মতো বহুবিধ কারণেই কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন ক্রমহ্রাসমান। কংগ্রেসে এখন এমন কোনও নেতা বা নেত্রী নেই যিনি কিনা দলটিকে বর্তমান সংকট থেকে টেনে তুলতে পারেন। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস ঘরানার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান, ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা এই দলের পক্ষে বিপদ সংকেতের মতো। এ কথা এ জন্যই বলা যায় যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত লড়াকু ভাবমূর্তির কংগ্রেস ঘরানার একমাত্র নেত্রী যিনি কিনা অদূর ভবিষ্যতে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন।

এ রাজ্যে দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকের বামশাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার জেরে তৃণমূল কংগ্রেস এখন রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে রাজ্যে রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। অথচ মমতার এই জয়যাত্রা রুখে দেওয়ার মতো কোনও অস্ত্র কংগ্রেসের হাতে নেই। এরকম একটি অবস্থায় তিস্তা জল চুক্তি থাকা কংগ্রেসের কাছে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো, মমতার উত্থান রুখে দেওয়ার জন্য অমোঘ অস্ত্রসম হতে পারে। কারণ এই চুক্তি রূপায়ণে ব্যর্থতার দায় একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে চাপাতে পারলে, বাংলাদেশের চোখে তাকে যেমন রাতারাতি ভিলেন বানিয়ে দেওয়া যাবে তেমনি শেষ মুহূর্তে এই চুক্তির বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন এই প্রচার চাপিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তাঁকে খামখেয়ালী প্রকৃতির ও অযোগ্য হিসেবে তুলে ধরা যাবে। এছাড়া এতে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল এ রাজ্যের মুসলমানদের একাংশকে হলেও মমতা বিমুখ করে কংগ্রেসমুখী করে তোলা যাবে এমন ভাবনাও হয়তো কংগ্রেস নেতৃত্ব ভেবে থাকতে পারেন।

এ রাজ্য থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী যখন এই জল বন্টন ইস্যুতে তার নিজের রাজ্যের স্বার্থের চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দোহাই দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ বড় বলে প্রতিক্রিয়া দেন তখন তা বোধহয় কংগ্রেসের তরফে মমতার বিরুদ্ধে জল অস্ত্র প্রয়োগের তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং বলেছেন যে রাজনীতিতে আসাটা তার জীবনে একটি দুর্ঘটনা। বরং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মতো একজন নিপাট ভদ্রলোক সৎ মানুষের এই মন্তব্যে এটা কি মনে হয় না যে তার সাম্প্রতিক ঢাকা সফরে রাজনীতির এমন সব জটিল কুটিল তত্ত্ব খেলছিল যা তার মতো সাদাসিধে মানুষের পক্ষে হজম করা মুস্কিল হচ্ছিল।

কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে যদি সত্যিসত্যিই মমতা ব্যানার্জীর উপর তিস্তার জল চুক্তির অস্ত্র প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করা হয়ে থাকে তা হলে বলতে হবে তারা একাজে আপাতত একশ ভাগ সফল। কারণ বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে মমতা ব্যানার্জী রাতারাতি মমতা-আপা থেকে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ভারতীয় নেত্রী হয়ে উঠেছেন। সে দেশে ভারত-বন্ধু বলে পরিচিত মুখগুলিও মমতার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতীয় মিডিয়াও মমতা বানার্জীর ঘাড়েই খামখেয়ালিপনা করে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্মান নষ্টের দায় চাপিয়েছে। কংগ্রেসের হয়তো আরও একটা মতলব ছিল। তা হলো মমতাকে এবার বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করাতে পারলে বাংলাদেশকে এত জল দিতে হোত যে উত্তরবঙ্গ মরুভূমি হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সর্বনাশের দায় মমতার ঘাড়ে চাপিয়ে কংগ্রেস এই এলাকায় রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করতে পারতো। মমতা হয়তো শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের এই চাল ধরতে পেরে নিজের ভাবমূর্তি উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই হয়তো উত্তরবঙ্গের মানুষের উদ্বেগ, নিজের দলের কোচবিহার জেলা নেতৃত্বের আপত্তিকে না দেখার ভান করে দেশের ও রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

পাকিস্তানের হয়ে সাফাই গাইছেন কিছু তথাকথিত মুক্তমনা ভারতীয়

আতিথি কলম

এস গুরুমূর্তি

গুলাম নবী ফাইকে আগে মনে করা হোত নিরীহ শান্তিকামী শুভচিন্তক মানুষদের একজন। কিন্তু পরে দেখা গেল 'ভারতের হাত থেকে মুক্ত হোক কাশ্মীর' এ ধরনের বিষয় নিয়ে ফাই আলোচনা সভার আয়োজন করেছে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। গত জুলাই মাসে তার আয়োজিত এক সভার আলোচনার ভাবভঙ্গি দেখে ভুরু কুঁচকেছে মার্কিন প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা। ফাই লোকটাকে আপাত শান্তশিষ্ট মনে হলেও সে যে মোটেও তা নয়, ভয়ঙ্কর মতলব রয়েছে তার বিভিন্ন সভাসমিতি আয়োজনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নানা স্তরের লোকজনকে জড়ো করে তার উদ্দেশ্য হলো প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তানের সপক্ষে প্রচার। তার মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসাই প্রাধান্য পাবে। এর মধ্যে একেবারে অঙ্ক-কষা মতলবী ব্যাপার এমনভাবে রয়েছে যে বেশ গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করলে বোঝার উপায় নেই কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কোন্ কৌশলে ভারত-বিরোধী প্রচারের ছক তৈরি হচ্ছে। আমেরিকার গোয়েন্দারা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে ফাই ব্যক্তিটি পাকিস্তানের আই-এস-আই-এর চর। তাকে ওইভাবে কাজ করার জন্যে বলা হয়েছে। সবক্ষেত্রেই যা হয় এক্ষেত্রেও তার পিছনে চর লাগানো ছিল। চরচক্রের অন্যতম সদস্য হলেও কোনও ফাঁকে তার যাবতীয় গোপন উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে গেছে। ফাই-এর মতলব না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সে যাঁদের ডেকে আনছে তাঁরাও কি সত্যিই একেবারে নিরীহ মানুষ? না তাঁদের পিছনেও সক্রিয় হিংসার শক্তি? এবং ভারত-বিরোধিতা?

একটু পিছনে যদি তাকানো যায় তাহলে ২০০১ সালের একটা ছবি ভেসে উঠবে মনের পর্দায় কিংবা চোখের সামনে তথ্য হিসেবে যেখানে ফাই লোকটির কাজকর্মের কিছুটা পরিচয় মিলবে। যা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে লোকটা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফ বি আই) ফাই আর তার কাশ্মীরী আমেরিকান কাউন্সিলের উপর নজরদারি করছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এখন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হচ্ছে ফাই পাকিস্তানের চরের কাজ করছে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য— যে কোনও কেরামতি দেখিয়ে লোকজনের মগজ ধোলাই। সেক্ষেত্রে সে অনেকটা সফল। আমেরিকা এবার আর হালকাভাবে দেখছে না তার ব্যাপার-স্যাপার। এখন আমেরিকার গোয়েন্দারা বুঝে গেছে ফাই হলো পুরোদস্তুর পাকিস্তানের চর।

বিখ্যাত কে পি এস গিল প্রায় দশ বছর আগে ২০০১ সালের ১ জুন দি ইন্সিটিটিউট অফ কনফ্লিকট ম্যানেজমেন্ট-এর পক্ষ থেকে বলেছিলেন : হিজাবুল মুজাহিদিন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে। আর এসব ব্যাপারকে মদত দিয়েছে গুলাম নবী ফাই কাশ্মীরী আমেরিকান কাউন্সিলের পক্ষ থেকে।

শুধু তিনি নন, একই রকম কথা লিখেছিলেন সুপরিচিত সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ পরভীন স্বামী দি হিন্দু গোষ্ঠীর পাক্ষিক পত্র ফ্রন্টলাইন-এ ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি লিখেছিলেন : হিজাবুল নিয়মিত দেদার টাকা পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও

কুলদীপ নায়ার

রাজেন্দ্র সাচার

কমল মিত্র

হরিন্দার বেওয়াজা

রীতা মনচন্দা

কুলদীপ নায়ার, বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার, অধ্যাপক কমল মিত্র চেনয়, রীতা মনচন্দা, হরিন্দার বেওয়াজা, গৌতম নভলাখা সেই সমাবেশে অংশ নেবেন বলা হয়েছিল। কাশ্মীরের কাগজে লেখা হয়েছে : 'তাঁরা ভারতীয় কিন্তু শুধু নামেই।' তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে : তাঁরা কথা বলছেন পাকিস্তানের সপক্ষে এবং বিচ্ছিন্নতার সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন। সেই প্রবন্ধের শেষ বাক্য : 'তাঁরা হলেন পাকিস্তানের মুখপাত্র।'

যুক্তরাজ্য থেকে। দুজন লোক টাকা জোগাড় করে পাঠাত। একজন আয়ুব ঠাকুর অন্যজন গোলাম নবী ফাই। এসব তথ্য মিলছে 'সাউথ এশিয়ান ইন্টেলিজেন্স রিভিউ : উইকলি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ব্রিফিংস' (খণ্ড সংখ্যা ৩১, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০০৩) থেকে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, ফাই টাকা জোগাচ্ছে সন্ত্রাসের জন্যে। পরভীন স্বামী লিখেছিলেন ২০০৬ সালে : গিলানী হজযাত্রীদের ব্যবহার করেছে আলোচনার জন্যে। ব্যবস্থা করেছে আমেরিকাবাসী ইসলামীপন্থী নেতা গোলাব নবী ফাই।

প্রামাণ্য তথ্য নির্ভরশীল নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা যা উদ্‌ঘাটন করেছেন তাকে জট পাকিয়ে দিয়েছে হিজাবুল মুজাহিদিনের পক্ষে ফাই। অনেকে ফাই-এর বক্তব্যকে সহজ সাদা মনে করেছে। আসলে তাই কি?

ক্যাপিটল হিলে মুক্তবাদী ভারতীয়দের ২৯-৩০ জুলাই ২০১০-এর সমাবেশের ছমাস আগে কাশ্মীরের একটি জনপ্রিয় দৈনিক 'দ্য আরলি টাইমস' একটা লেখা বেরোয়, যার শিরোনাম ছিল : ভারত-বিরোধী সমাবেশ জুলাই মাসে। ওয়াশিংটন হবে ভারত-বিরোধী কাজকর্মের ঘাঁটি।

কুলদীপ নায়ার, বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার, অধ্যাপক কমল মিত্র চেনয়, রীতা মনচন্দা, হরিন্দার বেওয়াজা, গৌতম নভলাখা সেই সমাবেশে অংশ নেবেন বলা হয়েছিল। কাশ্মীরের কাগজে লেখা হয়েছে : 'তাঁরা ভারতীয় কিন্তু শুধু নামেই।' তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে : তাঁরা কথা বলছেন পাকিস্তানের সপক্ষে এবং বিচ্ছিন্নতার সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন। সেই প্রবন্ধের শেষ বাক্য : 'তাঁরা হলেন পাকিস্তানের মুখপাত্র।'

কাশ্মীরী আমেরিকান কাউন্সিল-এর ওয়েবসাইট এ ব্যাপারের যাথার্থ্য প্রমাণিত করেছে। এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ফাই-এর লেখা। তার মধ্যে পাকিস্তানের অনুকূলে চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফাই-এর সব কথাই পাকিস্তানের প্রতিধ্বনি। এক্ষেত্রে ফাই নিজের চরিত্র কারও কাছে গোপন রাখেনি। শুধু আমেরিকা তাকে চিনতে বুঝতে দেরি করেছে।

আমেরিকার গুপ্তচরচক্র যেসব তথ্য পেয়েছে তা সারা ওয়েব লিনডন প্রচার করেছেন ২০১১ সালের ১৮ জুলাই। তাতে সৈয়দ গোলাম নবী ফাই সম্বন্ধে যা বলা হয় সব একেবারে চমক লাগানো। বলা হয়েছে : তদন্ত করে দেখা গেছে পাকিস্তান সরকার এবং আই এস আই সরাসরি যুক্ত রয়েছে ফাইয়ের কাজকর্মের সঙ্গে। ফাই কাজ করছে সরাসরি আই এস আই-এর সমর্থনে ও নির্দেশে। ফাই ভারত-বিরোধী প্রচার কাজের জন্যে দেদার টাকা পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে শুধু আই এস আই পাঁচ লক্ষ ডলার দিয়েছে ফাইকে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আই-এস-আই থেকে ফাই যে টাকা পেয়েছে তার পরিমাণ ৪০ লক্ষ ডলার। আর জানা যাচ্ছে ফাই যা যা বলবে তার ৮০ শতাংশ জানিয়ে দেয় আই এস আই। বাকি ২০ শতাংশ ফাই নিজের মতো করে বলতে পারে। ফাইয়ের জন্যে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করেছে আই এস আই। তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে নানাজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের। আরও জানা গেছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের আলোচনা সভার জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার খরচ হয়েছে।

মার্কিন গুপ্তচরচক্র বলেছে, একেবারে নগদ ৩৫ হাজার ডলার ফাই-এর সভার জন্যে খরচ হয়েছে। তথাকথিত মুক্তিবাদী অতিথিদের জন্যে আই এস আই-এর টাকা খরচ হয়েছে। এসব কাজে ফাই আর কাশ্মীরী আমেরিকান কাউন্সিল উগ্রপন্থীদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

যারা ফাই-এর সমাবেশে যোগ দেয়নি তাদের ব্যাপারে সংশয় রয়ে গেছে। দি আরলি টাইমস ২০১০ সালের ১ মে যা লিখেছে তাতে প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া পরামর্শদাতা হরিশ খারে, প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্ত জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যস্থতাকারী দিলীপ পদগাঁওকার-এর নাম লেখা হয়নি। অন্য মাধ্যমগুলো পদগাঁওকারের নাম লিখেছে। শুধু 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' হরিশ খারের নাম লিখেছে। খারে অস্বীকার করেছেন তাঁর সঙ্গে ফাইয়ের পরিচয় ও সমাবেশের কথা। তবে পদগাঁওকার অস্বীকার করেননি। মোদ্দা কথা ভারতীয় দূতাবাস ফাই-এর ডাকে আসা নামী ভারতীয়দের উপর নজরদারি করেছে কি? সুব্রহ্মমনিয়ম স্বামীর উপর নজর রাখা হয়েছিল, কারণ তিনি মুক্তিবাদী নন।

ফাই তার সমাবেশের নিরাপত্তা দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে ভারত বিরোধী ব্যাপার-স্যাপারগুলো স্পষ্ট হয়েছে। যেসব ভারতীয় নিজেদের মুক্তচিন্তাবাদী বলে দাবি করেন তাঁদের আসল চেহারাটা গোলাম নবী ফাই তুলে ধরেছে। এঁরা পাকিস্তানের সপক্ষে সাফাই গাইছেন আর ভারতে বিভিন্ন সম্মানিত পদে থাকছেন।

(লেখক : বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তম্ভলেখক)

কঙ্কাল-কান্ডে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আলিমুদ্দিনের নেতারাও রেহাই পাবেন কেন ?

বাণীপদ সাহা

মধ্যযুগে জ্যান্ত মানুষকে কবর দিয়ে বর্বরোচিত প্রাণনাশের ঘটনা শোনা যায়। ১৯২১ সালে ভারতের মালাবার উপকূলে মোপলা (Moplah) সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও হত্যালীলার বহু নৃশংস ঘটনা আজও সভ্য মানুষকে স্তম্ভিত করে। মোপলা সম্প্রদায় আরব দেশের মানুষ। অতীতে সমুদ্র পেরিয়ে মালাবার উপকূল অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। খিলাফত আন্দোলনের অছিলায় ভারতে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মোপলাদের টার্গেট হয়ে উঠে ওই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়। ধর্মান্ধ মোপলারা জীবন্ত মানুষের শরীরের চামড়া তুলে ফেলে হত্যা করতো। আবার অসহায় ও নিরপরাধ ব্যক্তিকে তার কবর খুঁড়তে বাধ্য করতো এবং নারকীয় হত্যার পরে সেই কবরেই তাকে মাটি চাপা দিত। এ সব পৈশাচিক ঘটনার বিবরণ আজও মানুষকে শিহরিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ শাসনকালে একাধিক নারকীয় হত্যা, কঙ্কাল উদ্ধার, অত্যাচার ও মানুষ নিধন যজ্ঞের নির্মম উদাহরণ এবং স্ট্যালিনিস্ট কমিউনিস্টদের নির্দয় ও নৃশংস আচরণ মোপলাদেরও হার মানিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, কঙ্কাল কাণ্ড, রাজ্য সরকারের প্রধান শরিক সিপিএম দলের মন্ত্রী ও প্রথম সারির কর্মীদের মদতে পৈশাচিক হত্যা, প্রাণহীন দেহ ও আহত মানুষদের মাটিতে পুঁতে ফেলার একাধিক ঘটনা এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনামাফিক একের পর এক হত্যাকাণ্ড, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে পুঁতে ফেলা এবং প্রমাণ লোপ ইত্যাদি সাধারণভাবে ঘটে না। অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, কোনও এক বৃহৎ শক্তি অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক না হলে এ প্রকার নজিরবিহীন অপরাধ কোনমতেই বাস্তবে ঘটা সম্ভব নয়। যে দেশে নির্বাচিত সরকার ও আইনের শাসন বলবৎ রয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে জঘন্যতম অপরাধীও এ রকম সংগঠিত ও পুনরাবৃত্ত অপরাধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হবে না। সিপিএম-এর শাসনে অপরাধীরা আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে সাধু সেজে

উল্লেখযোগ্য, কঙ্কাল কাণ্ড, রাজ্য সরকারের প্রধান শরিক সিপিএম দলের মন্ত্রী ও প্রথম সারির কর্মীদের মদতে পৈশাচিক হত্যা, প্রাণহীন দেহ ও আহত মানুষদের মাটিতে পুঁতে ফেলার একাধিক ঘটনা এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনামাফিক একের পর এক হত্যাকাণ্ড, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে পুঁতে ফেলা এবং প্রমাণ লোপ ইত্যাদি সাধারণভাবে ঘটে না। অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, কোনও এক বৃহৎ শক্তি অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক না হলে এ প্রকার নজিরবিহীন অপরাধ কোনমতেই বাস্তবে ঘটা সম্ভব নয়।

সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এর পেছনে শাসক দলের ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত স্ফটিকের মতোই স্পষ্ট। অপরাধের পরিকল্পনা ও ব্লু প্রিন্ট নিঃসন্দেহে একাধিক মাথা ও যৌথ প্রচেষ্টার ফল। বলাবাহুল্য, এ প্রকার উত্তেজনাকারী ঘটনা স্থানীয় জণগণের ও পুলিশের নজর এড়ায়নি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (intelligence) নিশ্চয়ই অপরাধের গোপন তথ্য এবং মূল্যবান সূত্রের গন্ধ পেয়েছে। তথাপি পুলিশ ও প্রশাসন কেন এর অনুসন্ধান করেনি এবং সত্য উদঘাটনে কেন তৎপর হয়নি সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়। প্রশাসন ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করে যে, হয় তারা পুরোপুরি অযোগ্য অথবা রাজনৈতিক চাপে ঘটনা জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চলের বাসিন্দা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। মন্ত্রী ও সিপিএম ক্যাডারদের ভয়ে অঞ্চলের নিরপেক্ষ মানুষ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারতো না। ২০০০ সালে পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। পশ্চিম মেদিনীপুর সিপিএম-এর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে ছন্দপতন, সিপিএমের গর্বে ও আধিপত্যে গভীর আঘাত আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কোনও মতেই মেনে নিতে পারেনি। কাজেই দলীয় নেতৃত্ব দলের শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সুশান্তবাবুকে বেছে নিয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল ফ্রি হ্যান্ড (free-hand)। পুলিশ ও প্রশাসনকে স্বভাবতই বলা হয়েছিল, তোমরা চোখ বুজে যাক। অপরাধ, হত্যা, বিরোধী দলের কর্মী ও সমর্থকদের নিধন ইত্যাদি তোমাদের দেখার দরকার নেই। সুশান্তবাবু ও ক্যাডার সবকিছু সামলে নেবে। কাজেই সুশান্তবাবু ও তার আজ্ঞাবহ দলের ক্যাডাররা ওই অঞ্চল থেকে বিরোধী দলের কর্মী ও সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করতে পেশীশক্তি ও রক্তপাতের রাস্তা বেছে নেয়। সুশান্তবাবু চরম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সিপিএমের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিরোধী কর্মীদের

বেছে বেছে হত্যা, বাড়ী ঘরে অগ্নিসংযোগ, মাঠের ফসল ধ্বংস ইত্যাদি অপ্রতিহত গতিতে চালিয়ে এলাকা প্রায়-বিরোধী শূন্য করে ফেলেন। কেশপুর, ছোট আঙ্গারিয়া, চকমাইতলা প্রভৃতি এলাকায়, প্রতিবাদী মানুষকে হত্যা, তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যার পরে গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দেওয়া, মৃতদেহ গায়ের ও অভিনব উপায়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট ইত্যাদি— নতুন কায়দার সন্ত্রাস তৈরি হয়। সুশান্তবাবুর তথাকথিত জমিদারিতে নিরীহ বসবাসকারী মানুষ আশঙ্কায় ও ভয়ে কুঁকড়ে যায় এবং মুখ খোলার সব শক্তি হারিয়ে ফেলে। পশ্চিম মেদিনীপুরে মাওবাদীদের সন্ত্রাস পরোক্ষে সুশান্ত ঘোষ ও সিপিএম ক্যাডার নিজেদের হত্যালীলা ও অপকর্মের দায় মাওবাদীদের উপরে চাপিয়ে সাফাই গাইবার সুযোগ পেয়ে যায়।

জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা বেছে বেছে প্রায় ৭২ জন সিপিএম কর্মীকে হত্যা করে। ছত্রধর মাহাতোর PCAPA সংগঠনের কর্মীরা সিপিএমের কয়েকটি অফিস, নেতাদের বাড়ী আক্রমণ করে প্রভূত ক্ষতি করে। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে মাওবাদীদের প্রায় কোণঠাসা করে ফেলে। এ সুযোগে সিপিএম ক্যাডার বহু এলাকা পুনর্দখল করে সশস্ত্র ক্যাম্প বসিয়ে দেয়। এই অপারেশনের প্রধান ছিলেন সুশান্তবাবু ও স্থানীয় সিপিএম নেতা দীপক সরকার। ঝাড়খণ্ড থেকে গুণ্ডা আমদানী করে দলের সশস্ত্র ক্যাম্পগুলিতে নিয়োগ করে। উত্তর ভারত, বাংলাদেশ থেকে উত্তরবঙ্গের চোরা পথে বহু অস্ত্র আমদানী করে। ক্যাম্পের হার্মাদবাহিনী গ্রামবাসীদের ভীতি ও অত্যাচারের মাধ্যমে দলের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় হয়। দ্বিতীয়ত, গ্রামের বহু যুবককে জোর করে হার্মাদ বাহিনীতে ভর্তি করতে উদ্যোগী হয়। ফলে গ্রামবাসীদের পুঞ্জিভূত অসন্তোষ একদিন নেতাই গ্রামে ফেটে পড়ে। অত্যাচারী হার্মাদ বাহিনীর গুলিতে চারজন স্ত্রীলোক সহ নয় জনের প্রাণবলি হয়। হার্মাদ বাহিনী মোতায়ন করে এলাকা দখল ও দলের আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। সেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ। তিনি দলকে আশ্বস্ত করেছিলেন, সিপিএম পুনরায় এলাকা নিয়ন্ত্রণের এবং ওই অঞ্চলের জনগণের সমর্থন পেশী শক্তির সাহায্যে অবশ্যই আদায় করতে সমর্থ হবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-ই বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

সুশান্তবাবু ও দলের কর্মীদের দাপট, নির্দয়তা ও প্রতিশোধ স্পৃহার সীমা ছিল না। তার নির্দেশ অমান্য মানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। নির্বাচনে তিনি পেয়েছিলেন রেকর্ড সংখ্যক ভোট। প্রতিপক্ষ পেয়েছিল মাত্র ৮ থেকে ১০ শতাংশ ভোট। এখানে পেশী শক্তি ছিল তার প্রধান হাতিয়ার। গত ১৯ মে ২০১১, নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পরেই চাকা ঘুরে যায়। ভীত ও অত্যাচারিতে মানুষ সাহস ফিরে পেয়ে গোপন তথ্যকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়ে উঠে। দলে দলে নিপীড়িত মানুষ গোপনে মজুত অস্ত্র ও গোলা বারুদ ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে থাকে। বহু গোপন আস্তানার খবর জনগণের সহযোগিতায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। আশ্চর্য, পুলিশ ও প্রশাসন দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করে কর্তব্য পালনে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়। দুই মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রায় ১৫০০ বিভিন্ন ধরনের রাইফেল, বন্দুক এবং কয়েক'শ গুলি ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরে অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলার ও সংগ্রহের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন সুশান্তবাবু। সিপিএম নেতা তপন ঘোষের বাড়ীর পাম্প হাউসে অস্ত্র তৈরি ও মেরামতির গোপন কারখানা, দেহবাগড়িয়া গ্রামের প্রভাকর সর্দারের বাড়ী থেকে প্রচুর অস্ত্র এবং এক হাজার গুলি উদ্ধার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা মন্ত্রীর মদতেই সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রীর বাড়ী থেকে অস্ত্র ছাড়াও, দুটি ওয়ারলেস সেট, স্পাই পেন এবং কলকাতার ফ্লাট থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

মন্ত্রীর গ্রাম বেনাচাপড়া। তার বাড়ীর অনতিদূরে মাটি খুঁড়ে মানুষের দু'টি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। ওয়ারিশরা ২টি কঙ্কালকে সনাক্ত করেছে। ডি এন এ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে এদের রক্তের সংযোগ ও পূর্ব পরিচয়। পরে জঙ্গলমহলের কাশীগড়া থেকে দুটি কঙ্কাল মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। রাজ্যের সি আই ডি তদন্ত শুরু করেছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, হত্যার পরে দুটি মৃতদেহ বহন করে আনা হয়েছে বেনাচাপড়া গ্রামে। সেখানে মাটি খুঁড়ে এদের চাপা দেওয়া হয়েছে। যারা ভয়ে এই পৈশাচিক কাজে হাত লাগিয়েছিল, তারা এখন স্বীকার করতে ইতস্তত করেনি। বহু সাক্ষী একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, সুশান্তবাবুর নির্দেশে তারা এ অপরাধে হাত লাগাতে বাধ্য হয়েছিল। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মাটি খোঁড়া ও মৃতদেহগুলি চাপা দেওয়ার সময় সুশান্তবাবু উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুশান্তবাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ হেফাজতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু গোপন তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী এখন জেল হেফাজতে। তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। মহামান্য আদালত সেই কারণে জামিন মঞ্জুর করতে আপাতত রাজি হয়নি।

সুশান্ত ঘোষের গ্রেপ্তার নিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মন্তব্য করেছে যে, নতুন সরকার প্রতিরোধমূলক মনোভাব নিয়ে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করেছে এবং অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাক্তন সাংসদ মহঃ সেলিম নতুন সরকার ও সি আই ডি-র বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে। তবে একের পর এক প্রমাণ সহ তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকলে, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট রণে ভঙ্গ দেয়। অভিযোগের গুরুত্ব, অকাট্য প্রমাণ ও জনমত উপলব্ধি করে সিপিএমের নেতাগণ চুপসে পড়ে। আদালতে আসামী সুশান্ত ঘোষকে ক্ষুব্ধ বিশাল জনতা সম্মিলিতভাবে ধিক্কার জানায়। নিরপেক্ষ বিচারে প্রমাণিত হয় যে, কঙ্কাল কাণ্ড, হার্মাদ ক্যাম্প, জুলুম, হত্যা, অত্যাচার, ভীতির বাতাবরণ ইত্যাদি শুধু সুশান্ত ঘোষের একক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে হয়নি। বলতে বাধা নেই, এ সব ঘটনার আড়ালে তাবড় তাবড় সিপিএম নেতাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের প্রধান ও পুলিশ প্রধান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার উৎস। নেপথ্যে নেতা ও উপদেষ্টাদের ভূমিকা, ক্যাডার ও দুষ্কৃতীদের জুলুম ও দৌরাত্ম্য মুখ্যমন্ত্রীর বিশদভাবে জানা ছিল। পুলিশ বিভাগের প্রধান হিসাবে, আগাম খবর, গোয়েন্দাদের রিপোর্ট, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আই বি রিপোর্টে তিনি নিয়মিত পেয়েছেন। এভিন্ন, রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রবীণ অধিকারীরা প্রতিদিন সরাসরি রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনা তার নজরে এনেছেন, একে বলা হয়, secret briefing. কাজেই তিনি উপরোক্ত ঘটনাগুলির একেবারেই কোনও আভাস পাননি বল্লে, সত্যের অপলাপ হবে। সুতরাং জঙ্গলমহলে অত্যাচার, রক্তপাত, হার্মাদ বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনের গভীর ষড়যন্ত্র শুধু সুশান্ত ঘোষের একার দায়িত্ব মোটেই নয়। সিপিএম নেতৃত্ব এখন সুশান্ত ঘোষের উপর সব দোষ চাপিয়ে পিঠ বাঁচাতে সচেষ্ট। অতএব, যত দোষ, নন্দ ঘোষ, এ প্রবাদ ঝেড়ে ফেলে কঙ্কাল কাণ্ড সহ, হত্যা ও অত্যাচারের সব ঘটনার দায়ী ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি বিধানের রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে। পুলিশ বিভাগ ও প্রশাসনের কর্তাদের গাফিলতি ও নিষ্ক্রিয়তা অনুসন্ধান করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন। জনস্বার্থ রক্ষায় জন্য এদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। প্রাক্তন পুলিশ মন্ত্রী নাকি সংস্কৃতিবান, তিনি জেনেশুনেও কেন নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং অপরাধ নিবারণে কেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, এ রহস্যের কিনারা অবশ্যই করা উচিত। সুশান্ত ঘোষ যদি অপরাধী হয়, আলিমুদ্দিনের তৎকালীন নেতাগণ ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনের লম্বা হাত থেকে কেন রেহাই পাবে?

[লেখক : ওড়িশা পুলিশের প্রাক্তন ডি জি]

চৌত্রিশ বছরের শবসাধনা

বাসুদেব পাল

রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুই সিপিএম নেতা গৌতম দেব ও বিমান বোস জোর গলায় বলে যাচ্ছিলেন যে, তাঁরাই রাজ্যে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করবেন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কিসের ভিত্তিতে তাঁরা ওই দাবি করছিলেন? তাঁদের মূল্যায়ন যে ভুল ছিল, পরবর্তীতে বিমানবাবু কয়েকবার তা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তাহলে সেদিন তাঁরা ওকথা বলছিলেন কিসের জোরে? এখানেই যে প্রসঙ্গ উঠে আসে তা হলো নির্বাচন ও সরকার গঠনের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ। সম্ভবত ফলাফল প্রকাশের পর পরই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ব্যাপক পরিমাণে আধুনিক দেশী-বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য (দেশীয় বা স্থানীয় কুটীর শিল্প কারখানায় তৈরি ওয়ান শাটার বন্দুক ও বোমা-জাতীয়) অস্ত্রশস্ত্র ব্যাপক পরিমাণে মাটির তলা থেকে, পুকুরের কাদা থেকে, দলীয় কার্যালয় ও ক্যাডারদের বাড়িঘর থেকে উদ্ধার হতে থাকে। এবং এখনও হচ্ছে।

এরপরই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়, মাটির তলা থেকে উঠে আসতে থাকে নরকঙ্কাল। হঠাৎই দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ তৃণমূলের ঘূর্ণিঝড়কে উড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও আগাম জামিনের আবেদন জানান। হাইকোর্ট প্রথমে কিছুদিনের জন্য তা মঞ্জুর করলেও নির্দিষ্ট সময়সীমার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন তিনি জেল- হেফাজতে। তাঁর বেনাচাপড়ার (গড়বেতা থানা) বাড়ির কাছের দাসের বাঁধ এলাকা থেকে হাড়গোড়-কঙ্কাল মাটির তলা থেকে উদ্ধার হয়। একই সঙ্গে আরও অনেক জায়গা থেকেও (গোয়ালতোড়ের জঙ্গল) কঙ্কাল-হাড়গোড় উদ্ধার হতে থাকে। কঙ্কালের দাবিদার এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের আবির্ভাব ঘটে। কেশপুর এবং পিয়াশালা গ্রামের নিখোঁজদের বাড়ির লোকেরা যারা তৃণমূল সমর্থক তারা এফ আই আর করাতে একের পর এক গ্রেপ্তার হচ্ছে, তদন্ত চলছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য গত বৎসরের শেষ দিকে কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো রিপোর্টে এ রাজ্যের জঙ্গলমহলে পঞ্চাশটির বেশি হার্মাদ শিবির শাসকদল কর্তৃক চালানো হচ্ছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তখন রাজ্যের তৎকালীন বিদায়ী পুলিশ প্রধান ভূপিন্দর সিং জোরগলায় রাজ্যে কোনও হার্মাদ শিবিরের অস্তিত্বই নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন। তার কদিন বাদেই রাজ্য পুলিশের ডি জি হিসেবে দায়িত্ব নেন নপরাজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তাঁর কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে তদন্ত করে দেখা হবে। পরদিনই রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল নপরাজিৎ- বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে হার্মাদ শিবিরের তালিকা তুলে দেন। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, তিনি আদৌ ওই হার্মাদ শিবিরগুলির বিষয়ে তদন্ত করেছিলেন কিনা। যদি তদন্ত করিয়েও থাকেন তাহলে তার রিপোর্টে কি ছিল? এখন তো কঙ্কালকাণ্ডে সব চাপা পড়ে গেছে। এখন আর হার্মাদ শিবির নয়, তদন্ত হচ্ছে হার্মাদদের হাতে নিহতদের রাতারাতি চাপা দেওয়া এবং ইদানিং মাটির তলা থেকে বের হওয়া 'কঙ্কাল' নিয়ে। সংবাদমাধ্যম এটাকে কঙ্কালকাণ্ড বলেই নামাঙ্কিত করেছে।

কঙ্কাল নিয়ে রাজনীতির বদলে সত্য উদঘাটন হলে অর্থাৎ মৃতদের পরিচয় ও হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান হলে জনমনে নতুন সরকারের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। বাম আমলে নিখোঁজ অন্যান্য দলের কর্মীদের বিষয়ে জনসমক্ষে বিস্তারিত বিবরণ উঠে এলে এবং তাদের সবকিছু জানা গেলে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের পথে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি হবে।

হার্মাদ শিবির তখন পুরো জঙ্গলমহলে চালু হয়নি। কিন্তু সেসময় লক্ষণীয় একটা ঘটনা ঘটে গেল। ২০০১-এর জানুয়ারিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার প্রত্যন্ত এলাকা ছোট আঙারিয়ায় গণহত্যাকাণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শী বক্তার মণ্ডল। কলকাতা তৃণমূল শিবিরে এসে সে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান দিয়েছিল। কিন্তু শাসকদলের হার্মাদবাহিনীর চাপে সে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে যায়। পুরো বক্তব্য অস্বীকার করে পিছিয়ে যায় বক্তার। তবে চাপে না বলে শাসানিতে বলাই বোধহয় সঙ্গত হবে। ছোট আঙারিয়া কাণ্ডে নাম জড়িয়ে পড়ে দলের সম্পদ বলে বিখ্যাত গড়বেতা এলাকার দুই নেতা তপন ঘোষ ও শুকুর আলির। এঁরা দীর্ঘদিন ফেরার ছিলেন। পরে ২০০৭-এ নন্দীগ্রাম হত্যাকাণ্ডে মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে পাচার করতে গিয়ে তৃণমূলের দলীয় ক্যাডারদের হাতে আটকে পড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পরে তাঁদের স্থান হয় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। জামিন হতেই সিপিএম-এর মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক দীপক সরকার ফুলমালা দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের বরণ করেন এবং 'দলের সম্পদ' আখ্যা দেন।

এখানে বলা দরকার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে জনশ্রুতি যে, এঁরাই মূলত হার্মাদ যোগাড় করা, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের উপরে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ ও দীপক সরকার।

বিশ্বস্ত সূত্র মতে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং বিধানসভা উপনির্বাচনে ব্যাপক পরাজয়ের পর

গায়ের জোরে এলাকা দখল এবং মূলত নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে হার্মাদ বাহিনীর সৃষ্টি হয়। শাসক দল হলেও পুলিশের উপর ভরসা আর রাখতে পারছিল না সিপিএম। বস্তুত ক্ষেত্র বিশেষে হার্মাদবাহিনী দলকে ব্যাপক সাফল্যও এনে দেয়। রাজ্যের ব্যাপক বেকার, অশিক্ষিত বেকার এবং বেশকিছু বখাটে ছেলে হার্মাদ বাহিনীতে যোগ দেয়। জনশ্রুতি আরও— বাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রভূত ভোগ-উপভোগ, খানাপিনার বন্দোবস্ত ছিল। ছিল মারা গেলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এককালীন কয়েক লক্ষ টাকা। সংবাদপত্রে কমবেশি খবর বের হলেও পুলিশকে কখনও এ নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করতে দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত তৎকালীন পুলিশ প্রধান ভূপিন্দর সিং-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। মেদিনীপুর শহর ও থানা এলাকার এনায়েৎপুরেই নাকি প্রথম হার্মাদ প্রশিক্ষণ শিবির হয়। পরে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় হার্মাদ শিবির স্থাপিত হয়। মাঝে মাঝে হার্মাদবাহিনীর সঙ্গে অন্যান্যদের লড়াইয়ের খবরও কাগজে বের হতে থাকে। এখানে স্বাভাবিকভাবে 'লালগড়' এলাকার কথা এসে পড়ে। লালগড়ের সুবিশাল শালজঙ্গলে মাওবাদীরা ঘাঁটি গাড়ার পরেই এলাকার অত্যাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদলের নেতাদের এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবাহিনীর উপর প্রাণঘাতী হামলা শুরু হয়। এক্ষেত্রেও হার্মাদবাহিনীকে দিয়ে এলাকা দখলে রাখার সবরকম প্রয়াস চলে। ২০০৮-এর নভেম্বর মাসে পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটি গঠনের পর এলাকার বঞ্চিত পীড়িত অত্যাচারিত জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ কমিটির পতাকাতলে সববেত হয়। প্রমাদ গোণে স্থানীয় সিপিএম নেতৃবৃন্দ। এলাকা হাতছাড়া হতে থাকে। ২০০৯-এর জুন মাসের প্রথমার্ধে লালগড় জোনাল কমিটির সম্পাদক অনুজ পাণ্ডে ও লালগড়ের দলীয় কার্যালয় আক্রান্ত হলে ১৮ জুন যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হয়। যৌথবাহিনীর কয়েক হাজার জওয়ান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং স্কুলবাড়িতে ঘাঁটি গাড়ে। যতদূর খবর যৌথবাহিনীকে কিন্তু স্থানীয় থানার অধীনেই ঘোরাফেরা করতে হয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে চলতে থাকে হার্মাদ শিবির। সাঁকরাইল থানার ওসি অপহরণ ও প্রত্যর্পণের পর মাওবাদীরা একটু পশ্চাৎ অপসরণ করে। যৌথবাহিনীর উপর চাপ বাড়ে। এই হার্মাদবাহিনী এবং যৌথবাহিনীর উপর ভর করেই এলাকাছাড়া নেতারা মেদিনীপুর-ধেড়ুয়া রুট ধরে শহরের আশ্রয় ছেড়ে লালগড় এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে। সব হিসেব গুলিয়ে দেয় এবছরের ৭ জানুয়ারী লালগড়ের নেতাইগ্রামে কমরেড রথীন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে হার্মাদদের গুলি চালিয়ে নয়জন গ্রামবাসীর (চারজন মহিলা সহ) হত্যা। প্রসঙ্গত, ছোটখাটো জোতদার রথীন দণ্ডপাটের পিতা স্বর্গীয় নরসিংহ দণ্ডপাট লালগড় হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। রথীনের বড়দাও দক্ষিণ কলকাতায় একটি হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক।

জনরোষ, মিডিয়া ও বিরোধী দলের সক্রিয়তায় এবার আর মৃতদেহ চাপা দেওয়া গেল না। নেতাই-এর ঘটনার ফলে হার্মাদ শিবিরগুলো নিয়ে ব্যাপক চর্চা-আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। আবার ক্ষমতায় না ফেরাতে বামনেতাদের ব্যাকফুটে চলে যেতে হয়।

যত্রতত্র কঙ্কাল উদ্ধার হতে থাকে, পাওয়া যায়নি অপহৃত পুলিশকর্মী সাবির আলি ও কাঞ্চন গড়াই-এর দেহ বা খবর। পাওয়া যায়নি লালগড়ের দুবরাজপুর গ্রামের কমরেড বুদ্ধদেব মাহাত এবং প্রাণেশ ঘোষকে। দুবছর পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোনও কমরেড ওই দুই নেতার বাড়িতে সান্ত্বনাটুকুও দিতে যাননি। তবে কোনও কোনও হার্মাদের লড়াইয়ে মৃত্যু হলে সুশান্ত বাবু এককালীন ক্ষতিপূরণ দিয়ে এসেছেন বলে জানা গেছে।

কঙ্কাল নিয়ে রাজনীতির বদলে সত্য উদঘাটন হলে অর্থাৎ মৃতদের পরিচয় ও হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান হলে জনমনে নতুন সরকারের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। বাম আমলে নিখোঁজ অন্যান্য দলের কর্মীদের বিষয়ে জনসমক্ষে বিস্তারিত বিবরণ উঠে এলে এবং তাদের সবকিছু জানা গেলে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের পথে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি হবে। প্রশাসন এবং বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপে হার্মাদবাহিনীর মূল স্রষ্টা ও পরিচালককেও জনসমক্ষে তুলে আনতে হবে।

যদি হার্মাদ ক্যাম্পের সংখ্যা কম করে ৫০ এবং ক্যাম্প প্রতি হার্মাদের সংখ্যা ৫০ জনও হয় তবে তাদের বেতন, ভাতা, থাকা-খাওয়া সব মিলিয়ে খরচের বহর কতটা তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে যোগান কোথা থেকে আসত সেটাও জানা যাবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার যে যুবকরা হার্মাদ বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল তাদের সেলফোনের কললিস্ট ও ব্যাঙ্কের পাস বই (যদি টাকা ব্যাঙ্কে রাখা হয় সে ক্ষেত্রে) পরীক্ষা করলেও অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেতাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত কয়েকজনের ছবিসহ বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি অপরাধী ধরা যায়? গোয়েন্দাদের পক্ষে এদেরকে ধরা খুব অসম্ভব নয়। আন্তরিক প্রয়াস ও সক্রিয়তা কঙ্কাল সৃষ্টির কারিগরদের মুখোশ খুলে দিতেই পারে।

সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শন

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অর্ধচন্দ্র ব্যাপারটার সঙ্গে বাঙালি'র চিরকালীন বীতশ্রদ্ধার সম্পর্ক। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট চন্দ্রপুলি নামক নারকোল-সমৃদ্ধ মিষ্টিটি চাখতে বেশ ভাল লাগলেও চন্দ্রপুলি সম অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঙ্গুলির হস্তের ঘাড়ধাক্কা খেতে কারই বা ভাল লাগে বলুন? সুতরাং অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে আড়ি থাকলেও পূর্ণচন্দ্র নিয়ে বাঙালি কিন্তু আপাদমস্তক রোম্যান্টিক। সে পূর্ণিমা চাঁদ-কে ঝলসানো রুটিই বলুন কিংবা চাঁদ-মামার প্রতি মামারবাড়ি সুলভ ভালবাসাই বলুন, তারকা-খচিত ঝলমলে আকাশে পূর্ণিমা-রাত্রে চাঁদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখে আপ্লুত হন না, এমন কঠোর হৃদয় মানুষ ভূ-ভারতে মিলবে না।

জীবনে হাজারবার পূর্ণচন্দ্র দর্শনের (জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে) বিরল সৌভাগ্য মানুষগুলোর সাংসারিক জীবনের শেষপর্ব যে সবসময়ে সুখের হয় না একথা প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করা খুব একটা কঠিন নয়। জন্মাবার পর থেকে জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে হাজারবার পূর্ণচন্দ্র দর্শন করতে হলে নিদেনপক্ষে আপনার বয়স হতে হবে ৮৩ বছর ৪ মাস। কারণ পূর্ণচন্দ্র দর্শনের সৌভাগ্য কেবলমাত্র পূর্ণিমাতেই হয় এবং মাসে একবারই কেবল পূর্ণিমা আসে। এই হিসেবে হাজারটি পূর্ণচন্দ্র দর্শনের জন্য অবশ্যই দর্শনকারীর বয়স নিদেনপক্ষে হাজার মাস হতে হবে। ১২ মাসে একবছর হিসেবে হাজার মাস মানে (১০০০/১২) অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস। তিরাশি উর্দ্ধ চুরাশি-তে পা দেওয়া কিংবা তার চেয়েও বেশি বয়স্করা সমাজে এমনকী তাদের নিজেদের পরিবারও অনেক ক্ষেত্রেই থাকেন অবহেলিত। তবে সুখের কথা, সমাজে এখনও এনিয়ে ব্যতিক্রমী ভাবনা আছে। আর সেজন্যই টিকে রয়েছে সমাজটা।

বিদায়ী বীরভূম জেলা সমাহর্তা সৌমিত্র মোহনের সঙ্গে 'শ্রদ্ধা'র সদস্যরা।

এমনই একটি ব্যতিক্রমী ভাবনার নাম 'শ্রদ্ধা'। বীরভূম জেলার সিউড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত এই সংস্থাটি ২০০৯ সাল থেকেই সমাজের সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারীদের পরিবারে গিয়ে সেই পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সংস্থার সদস্যরা সেই সঙ্গে পরিবারের সহস্র পূর্ণচন্দ্র-দর্শনকারী বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধাকে দেবজ্ঞানে পুজো করার ব্রত নিয়েছে। সংস্থার দায়িত্বে থাকা প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টায় সিউড়ি শহরের বেশিরভাগ বরিষ্ঠ বিদ্বৎজনদের অনুদানে সাধারণভাবে প্রতি মাসে ১ জন করে সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারীকে সম্বর্ধনা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার রীতি গত প্রায় আড়াই বছর ধরেই চালু রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে বিদায়ী বীরভূম জেলা সমাহর্তা সৌমিত্র মোহন-কে 'শ্রদ্ধা'র পক্ষ থেকে এবং বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ, শঙ্খবাদন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, চন্দন, পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় এবং পুস্তক প্রদান করা হয় সৌমিত্র মোহন এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্বেতা গুপ্তাকে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিবেকানন্দ কেন্দ্র, (কন্যাকুমারীর) শান্তিনিকেতনের বিভাগ প্রমুখ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'শ্রদ্ধা' সংস্থার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার।

মহাকরণে মহালয়া, টেমস নদীতে ভাসান

শ্রীচরণেষু দুর্গা মা,
কৈলাশধাম

মাগো প্রণাম নিও মা। পুজোর আগে এই আমার শেষ চিঠি। তাই তোমাকেই পাঠালাম। কলকাতা সেজে উঠেছে মা। তুমি আসবে বলে। না না, এ কলকাতা সে কলকাতা নয়। এই পশ্চিমবঙ্গও সেই পশ্চিমবঙ্গ নয়। এখন পশ্চিমবঙ্গের নাম ঢাকঢোল পিটিয়ে বদলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেছে। এবার পরিবর্তনের বাংলা, পরিবর্তনের কলকাতায় তুমি আসছ। আগেরবার যখন এসেছিলে তখনও 'পরিবর্তন' না 'প্রত্যাবর্তন' নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এবার সত্যি সত্যি তোমার যখন প্রত্যাবর্তন হবে তখন দেখবে কেমন পরিবর্তন হয়েছে। দেখার আরও বাকি আছে। কটা বছর যেতে দাও। দেখবে কলকাতাটা লন্ডন হয়ে গেছে। মহাকরণে মহালয়া আর তোমার ভাসান 'ভগবতী টেমস' এ।

দুর্গা মা, জানো, এখন বাংলায় 'আমরা ওরা' নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সব সময় মনে করিয়ে দেন যে 'আমরা ওরা' নেই। সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন তিনি 'ওরা'দের চিনিয়ে দেন আর 'ওরা' দলের লোকজনকে নানা কমিটিতে ঢুকিয়ে 'আমরা' করে নেন। কী বললে? পুজো কমিটি? না, না। এখন তো এই রাজ্যটা কমিটিরাই চালায়। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার যত কমিটি গড়েছে ততগুলো দফতরই নেই রাজ্য সরকারের। শুধু শিক্ষাতেই তো ডজন খানেক। আবার উচ্চশিক্ষায় আলাদা। আবার প্রেসিডেন্সির মানোন্নয়ন করতেও আলাদা কমিটি। তার নাম আবার মেন্টর গ্রুপ। হ্যাঁ গো মা, সত্যি বলছি ওই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যা আদিখ্যেতা হচ্ছে তাতে তোমারও রাগ হবে। যেন রাজ্যে যত পড়াশুনো ওই একটা জায়গাতেই হয়। এমনকি বিদেশ থেকে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকেও ডেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ করা সেই মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষায় মন দিন, শিশুদের স্বাস্থ্যে মন দিন। ইউনিভার্সিটি অনেক পরের বিষয়।

সত্যিই তো বল না মা, আগে রাজ্যের বাচ্চাগুলো পেট ভরে খাক, বেঁচে বর্তে থাকুক, অ-আ-ক-খ শিখুক তবে না বিদ্যে বোঝাই হবে। ভাবটা এমন যেন বাড়ির ভিতই হলো না এদিকে দোতলা, তিনতলা করার জন্য মাচা বাঁধা হচ্ছে।

যাই হোক, নোবেল ধমক খেয়ে মুখ্যমন্ত্রী এখন বলছেন হাজার হাজার শিক্ষক নেওয়া হবে। হাজার হাজার স্কুল হবে। অনেক অনেক কলেজ হবে। মাদ্রাসা তো হবেই। এদিকে মা, প্রতিমাসে একবার করে সাংবাদিকদের সামনে কাঁদেন, টাকা নেই, পয়সা নেই, প্রণবদাদার অনুদান নেই, মনমোহনের মন নেই। মাইনে দেব কী করে জানি না।

যাই হোক মা, তাবলে ভেব না তোমার পুজোয় জাঁক জমকে কোনও খামতি থাকবে। তোমার ভক্তরা সব এখন মন্ত্রী, বিধায়ক। একডালিয়ার এভারগ্রিন সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে মনে আছে তো! থাকবে না মানে। তিনি সত্যিই এভারগ্রিন। অনেকে অবশ্য বলে উনি নাকি তরমুজ। বাইরেটা এভারগ্রিন কিন্তু ভেতরটা এভার রেড। মূল—তৃণমূল চু কিৎ কিৎ খেলতে খেলতে উনি এখন ঘাসফুল মন্ত্রী। দফতরটা অবশ্য দুদুভাদু দফতর। জনস্বাস্থ্য কারিগরি। না আছে বাজেট, না আছে প্রজেক্ট। তবে সাইরেন বাজানো গাড়ি আছে। এছাড়াও কলকাতায় তোমার এক ডজন কেউকেটা ভক্ত এখন ক্ষমতার অলিন্দে। সুতরাং পরিবর্তনের বাংলায় এবার তোমার পুজো হবে ঠিক সেই ছাতুবাবু, লাটুবাবুদের আমলের মতো। ফোয়ারা ছুটবে, ফোয়ারা।

তা'বলে ভেব না যে মহাকরণের অলিন্দে তোমার পুজো হবে। সেটি হবে না। ওখানে পরিবর্তনের ছোঁয়ায় কিশোর কুমার থেকে মাদার টেরেজা সবার পুজো হয়েছে। কিন্তু দুগ্গা পুজো করা যাবে না। আফটার অল দেশ মানে রাজ্যটা ধর্মনিরপেক্ষ। হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী যেমন রমজানে ইফতার টিফতার করে ইদের নমাজেও অংশ নিয়েছেন, তেমনি একদিন একটা বেলা উপোষ করে তোমায় দুটি ফুল, বেলপাতা নিশ্চয়ই দেবেন। ওঁকে তুমি এক চোখো বলতে পারবে না। উনি ঠিক ব্যালেন্স করে দেবেন। তবে মহাকরণে মহালয়াটা চালু হতেই পারে। ওই দিনটার মধ্যে একটা সেন্টিমেন্টাল কাম কালচারাল ব্যাপার আছে। গান বাজনা হবে। তবে নো স্তোত্রপাঠ। বরং 'রেডিওর সেকাল একাল' নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

তোমারও বলিহারি মা। তুমি আসছো কিনা গজে চেপে। জান না, ওটা বহুজন সমাজ পার্টির হাতি। তোমার সিংহটা আবার ফরোয়ার্ড ব্লকের। পুজোয় ফুলটিও চাই। সেই বিজেপির পদ্ম। ভাগ্যিস হাতে অতগুলো অস্ত্রের মধ্যে কাস্তে বা হাতুড়ি নেই। তাই বাঁচোয়া। তবে একটা কথা বলে রাখছি। এবার ফুলের থেকে কিন্তু দুব্বো একটু বেশি পাবে। আরে বাবা ওটাই তো তৃণ। আর মূল মানে শিকড় সহ ওপড়ানো মাটি লাগা দুব্বোই দেওয়া হবে মা তোমার পায়ে। তবেই তো সত্যিকারের মা-মাটি-মানুষ স্লোগানের সার্থকতা নাকি!

হে মা উমা, শেষে একটা গোপন কথা বলি। আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তোমার খুব ভক্ত নন। দিদির ফেভারিট দেবী যদি বল তবে সেটা হচ্ছেন মা সন্তোষী। কেন হবে না বল তো। জুম্মাবার ছাড়া যে কোনও পবিত্র কাজ হতে পারে না সেটাই তুমি বুঝলে না। এই যে এবার তুমি আসছ বেশ ছুটির দিন দেখে রবিবার। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি চারদিনে শেষ। কিন্তু এই বারগুলো সব সাম্প্রদায়িক বার। শুক্রবারটা হলো গিয়ে একটা সেকুলার বার। ওইদিন মুসলমানদের ভালো, খিরিস্তানদের ভালো আর সন্তোষী মার ভালো। তাই দিদিরও ভালো। দিদির সিঙ্গুর আন্দোলন শুরু শুক্রবার। বেশিরভাগ বন্‌ধ শুক্রবার। নমিনেশন জমা দেওয়া শুক্রবার। রেল দফতরে ডান পা রাখা শুক্রবার। ভোটের রেজাল্ট ১৩ মে, শুক্রবার। হেঁটে হেঁটে মহাকরণ সেও ২০ মে, শুক্রবার।

আর মা দেখ তোমার প্রিয় পঞ্জিকাকারদের। ষষ্ঠী থেকে দশমী একটা শুক্রবার রাখতে পারল না! সত্যি...

তবে মা, দিদি কিন্তু তোমার দেখাদেখি দশ হাতে দশটা দফতর সামলাবার দায়িত্ব নিয়ে দশভুজা হয়েছিলেন। তারপর কেউ কেউ তোমার সঙ্গে তুলনা করা শুরু করতেই উনি সমঝে গেলেন। দুগ্গার সঙ্গে মিলের কথা বেশি কানাকানি না হওয়াই ভালো। কোথা থেকে কে চটে যায় বলা যায় না। তাই কদিন আগেই একটা হাত খালি করে সেটা সিঙ্গুরের রবীন্দ্রনাথবাবুকে দিয়ে দিয়েছেন। চিঠি আর বড় করব না। পড়তে গিয়ে তুমি পাছে দেরি করে ফেল তাই। তোমার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি মা। হে দুর্গতিনাশিনী, আমাদের দুর্গতি নাশ কর মা। তোমার শান্তিবারি শীতল করুক বিশ্বকে। অসুরেরা যে দাঁত, নখ উঁচিয়ে আছে মা। তোমার নতুন অস্ত্র হোক 'বম্ব ডিসপোজাল'। তাড়াতাড়ি এসো।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

বনবন্ধু পরিষদের প্রচেষ্টায় মালদার ভালুকবোনা আদর্শগ্রাম হয়ে উঠছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ মালদা জেলার অনুন্নত হবিবপুর ব্লকের তাজপুর থেকে ২ কিমি দূরে ভালুকবোনাতে ৩৩ বিঘে জায়গা জুড়ে বনবন্ধু পরিষদের একল বিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প এলাকার জনজাতিদের আশার আলো দেখাচ্ছে। এই গ্রামের সনেশ্বর মণ্ডল এক চিলতে জায়গা নিয়ে একল বিদ্যালয় শুরু করেছিল গত তিন বছর আগে। কলকাতার বনবন্ধু পরিষদের মাঙ্গীলাল জৈন এর আর্থিক সহায়তায় এই এলাকাটিতে গ্রামোত্থান প্রশিক্ষণ গড়ার পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে বনবন্ধু পরিষদের

এই গ্রাম শিক্ষামন্দিরে ৪৮২ জন ছাত্রছাত্রী চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করছে। এখানে বছরে তিনবার চক্ষু পরীক্ষা শিবির, মেডিক্যাল সেন্টার থেকে হোমিও ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ দেওয়া হয় প্রতিদিন ৩০-৪০ জন রুগীকে। এছাড়া ১১ বিঘে জমিতে ধান চাষ করা হয় সম্পূর্ণ জৈবিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ জৈব সার, গোমূত্র থেকে তৈরি কীটনাশক দিয়ে। তাছাড়া এই সব জমিতে কেঁচো সার তৈরি করে হলুদ, অরহড়, লঙ্কার চাষ করা হয়। আমগাছও লাগানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেলাইয়ের, কৃষিকাজের। হাতেকলমে কৃষিকাজ শিখে এখানকার কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। একটি ছাত্রাবাসে ২২ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। একটি গোশালা রয়েছে যেখানে ৫টি গোরু পালন করা হয়। এইসব গবাদি পশুর মলমূত্র চাষের কাজে লাগানো হচ্ছে। একটি অ্যাম্বুলেন্স ভালুকবোনা বনবন্ধু পরিষদ প্রকল্প এলাকাতে রয়েছে যা এই এলাকার রুগীদের রাত্রে বা অন্য সময়ে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এখানে রামসীতা মন্দির রয়েছে। সেখানে প্রতি বছর রামনবমী উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয়। ১০-১৫ কিমি দূরের এলাকার মানুষরা এখানে এসে থাকেন।

১৪ জন শিক্ষক বনবন্ধু পরিষদ একল বিদ্যালয় মন্দিরে পাঠদান করে। সঙ্গে গান বাজনা শেখানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। আগামীতে কম্পিউটার ও মোটর মেকানিকস্ প্রশিক্ষণ চালু করার ইচ্ছা রয়েছে উদ্যোক্তাদের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। মালদা ও বুলবুলচণ্ডী প্রভৃতি এলাকার সহৃদয় ব্যক্তিদের দানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থানীয় মানুষদের আশা ভরসার কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এই কেন্দ্রটির ৩৩ বিঘে জমি থেকে যে ফসল ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় তা বিক্রি করে ধীরে ধীরে এই উন্নতি সম্ভব বলে জানালেন প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা কানাই পান্ডে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের পরামর্শে এই প্রকল্প কেন্দ্রটি জেলার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দেখভালের অভাবে অসমে পূর্ব-পশ্চিম করিডরের কাজ দূর-অস্ত

সংবাদদাতা।। ন্যাশন্যাল হাইওয়ে অথরিটি কর্তৃপক্ষ অসমে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণে গতি আনার জন্য একজন চীফ্ জেনারেল ম্যানেজার-এর অফিস গুয়াহাটিতে খোলা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই অফিস কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রী কমলনাথ-এর উদ্যোগেই গুয়াহাটিতে ওই অফিস খোলা হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের কাজেও গতি আনতে সি জে এম-অফিসটি কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যদিও সূত্র মতে সি জে এম সাহেব অসমে কদাচিৎ গিয়েছেন। তাই ঠিক মতো দেখভাল ও তাগাদার অভাবে কাজের গতির বিশেষ হেরফের হয়নি। যখন তখন ছোটখাটো স্থানীয় সমস্যায় জেরবার হচ্ছে, কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

অসমে পূর্ব-পশ্চিম করিডরের অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ বিস্তর। একেবারেই শম্বুকগতি। আবার গুয়াহাটিতে চীফ্ জেনারেল ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে কাজের দেখভাল, তদারকি হচ্ছে না। আরও অভিযোগ— নির্মাণ সংস্থাও যথেষ্ট-সংখ্যক কারিগরী দক্ষ মানুষকে লাগাচ্ছে না। চুক্তিমতো দক্ষ প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগ করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ সব জেনেশুনেও নীরব। নির্মাণ সংস্থাগুলোও শর্ত মোতাবেক দুবার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ না করলেও তাদেরকে কোনওরকম জরিমানা করা হয়নি। যদিও চুক্তিমতে দুবার টার্গেট ফেল করলে জরিমানা দিতে বাধ্য। জালুকাবাড়ি থেকে নগাঁও রাস্তা প্রশস্ত করার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল ২০০৮ সালে। কিন্তু এখন অবধি যা অবস্থা তাতে ২০১২ সালের তা শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। নলবাড়ি— আমিনগাঁও সড়ক চওড়া করার কাজ শেষের সময়সীমা ছিল ২০১০ সালে। তবে তা ২০১৫-র আগে আদৌ সম্ভব হবে না। সরাইঘাটে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের কাজ ২০১৪ সালে শেষ হওয়ার কথা আছে। শিলচর-লামডিং রুটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবেমাত্র টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। শ্রীরামপুর- নলবাড়ি রুটে যে কাজ ২০১০-এ শেষ হওয়ার কথা তাও ২০১২-তেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

শিলচর-লামডিং রুট-এ কাজ শেষ হতে অতন্তপক্ষে আরও চার বছর লাগবে। জালুকাবাড়ি-জাগিরোড-এ একটা ফ্লাইওভারের কাজ অতিরিক্ত হয়েছে। জোড়াবাত-এ ওই ফ্লাইওভারের কাজে এখনও পর্যন্ত কেবল পাইলিং করার কাজ গত কয়েকমাসে হয়েছে। এই রুটে অনেক কালভার্ট এখন অর্ধেক সম্পন্ন অবস্থায় রয়েছে।

আফজল-কাসভদের ফাঁসি

২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ভারতের সংসদ ভবনের উপর সশস্ত্র আক্রমণের মূল পাণ্ডা আফজল গুরু এবং ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর (২৬/১১) মুম্বই হামলার একমাত্র জীবিত সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসভ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বর্তমানে ফাঁসির আগামী। ২০০৫ সালের ৪ আগস্ট আফজল গুরুকে এবং ২০১০ সালে আজমল কাসভকে সুপ্রিম কোর্ট ফাঁসির আদেশ দেয়। কিন্তু সেই আদেশ অদ্যাবধি কার্যকর হয়নি। ফাঁসি না হওয়ার কারণ আসামীদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে 'মার্সি পিটিশন' (ক্ষমাভিক্ষার আবেদন)। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির কাছে ২৭টি এরূপ আবেদন বিবেচনাধীন। তবে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, আফজল গুরু ও কাসভের দয়া ভিক্ষার আবেদন বিবেচনা করতে আরও ৭/৮ বছর লেগে যাবে। অতঃপর ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে তার কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। কারণ ইতিমধ্যেই তাদের কয়েক বছরের কারাবাস হয়ে গেছে। তাছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে আমৃত্যু কারাদণ্ড নয়। তা চৌদ্দ বছরের মেয়াদ শেষে তারা মুক্তি পেলে সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় তারা সব অধিকার ভোগ করে জীবনযাপন করবে। ভাবা যায়!

আমরা প্রায়ই শুনি, জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদীদের কোনও জাত-ধর্ম নেই। কিন্তু আফজল ও কাসবের ফাঁসি বিলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে জাত-ধর্মই কাজ করছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রের ইউ পি এ (কংগ্রেস) সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ''আফজলকে ফাঁসি দিলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে আঘাত করতে পারে।'' এখানে এই বিশেষ সম্প্রদায়টি যে মুসলিম তা বলাই বাহুল্য। কাসভকে বাঁচাতে রোজ ৯ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। ৪৫ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। এখন আফজল-কাসবরাই দেশকে দেউলিয়া করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এদিকে যখন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', ওদিকে তখন মানবাধিকার কর্মী অরুন্ধতী রায়, প্রফুল্ল বিদোয়াই, তিস্তা জাভেদ শেতলবাদরা আফজলের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

নেহরু পরিবারের ধর্ম

স্বস্তিকা, ২০ জুন, ৪০ সংখ্যায় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ 'যারা ধর্ম গোপন করে দেশ শাসন করছে', অতঃপর 'ইটালি থেকে আনীত রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এই শ্বেতাঙ্গিনী' লিখেছেন। সোনিয়া

ফিরোজ খানের পুত্রবধূ, রাজীব খানের পত্নী—তিনি মুসলমান, এটাই তাঁর পরিচয়।

মোহনদাস গাঁধী কারসাজি করে নিজের পদবীটা ফিরোজ খান ও ইন্দিরা খানকে, লোককে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে— ওদের মুসলিম পরিচয় গোপন রাখার জন্য ব্যবহার করতে দেন। ফিরোজের ধর্ম ইসলামই— এতে গোলযোগের কারণ দেখি না। ঢাকার নবাব পরিবারের ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ বিজয়লক্ষ্মী নেহরুকে নিয়ে পলায়ন করলে গাঁধীর নির্দেশে মাহমুদ বিদেশ যেতে বাধ্য হলো। তখন একজন পণ্ডিত ডেকে বিজয়লক্ষ্মীর তড়িঘড়ি বিয়ে দেন মতিলাল নেহরু। মোহনদাস নেহরু পরিবারের বরাবরের মুস্কিল আসান। সহৃদয় পাঠক ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন।

—ভূপতি চরণ দে, সন্তোষপুর, কলকাতা।

হিন্দুর শ্রদ্ধাবিন্দুতে আঘাত

কিছুদিন আগে সত্য সাঁইবাবা প্রয়াত হয়েছেন। অন্তিম সময়ে তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন দেশের সংবাদমাধ্যমে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত হওয়া এবং তাঁর বিভূতি প্রদান এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক ঘটনাকে তুলে ধরা হচ্ছিল নেতিবাচকভাবে, তাঁর গঠিত 'ট্রাস্টের মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ' এর খবরও প্রচারিত হয়েছে নানা ভাবে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে তাঁর সম্পত্তির বিষয়ে।

অতি সম্প্রতি কালোটাকা উদ্ধারের প্রশ্নে বাবা রামদেবের অনশন কর্মসূচীকে কটাক্ষ করে 'কংগ্রেসের 'বিনয় কোঙার' দিগ্বিজয় সিং এবং মুখপাত্র মনু সিংভি বাবা রামদেবের কর্মসূচীর ব্যয় এবং তাঁর পতঞ্জলি যোগপীঠের সম্পত্তির বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কাঞ্চী কামকোটির শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধেও এর আগে আর্থিক প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

বর্তমান হিন্দুর শ্রদ্ধাবিন্দুকে আঘাত করা কংগ্রেসী কালচার হয়ে উঠেছে। তাদের পক্ষ থেকে বাবা রামদেবকে 'ব্যবসায়ী' 'ব্লাডি ইন্ডিয়ান ডগ' প্রভৃতি ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে বার বার। যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও দলের নেতারা 'ম্যাডামে'র কথা না শুনে একটি পা পর্যন্ত ফেলেন না সেখানে নেতা কর্মীরা 'ম্যাডামের' নির্দেশ ছাড়া এই ধরনের মন্তব্য করছেন এটা বিশ্বাস করা শক্ত। অর্থাৎ পরিকল্পিত ভাবে হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধাবিন্দুগুলিকে জনমানসে হেয় করার চেষ্টা চলছে ম্যাডামেরই নির্দেশে। অথচ 'মিশনারিস- অফ চ্যারিটি' বা অন্যান্য মিশনারী গোষ্ঠীগুলি যে ভাবে টাকার লোভ দেখিয়ে এবং সেবার আড়ালে জনজাতি বনবাসী ভাইয়েদের ধর্মান্তরিত করে চলেছে সেই টাকার উৎস জানতে কোনওভাবেই আগ্রহী নয়। রাজনৈতিক দলগুলি বা আমাদের সত্যনিষ্ঠ মিডিয়া এরা দেখায় না মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে গড়ে ওঠা 'চার্চ'গুলিকে। প্রশ্ন তোলে না প্রাসাদসম চার্চগুলি তৈরিতে কোথা থেকে টাকা আসে। সেই বিষয়ে কেন এই পরিকল্পিত নিশ্চুপতা? এরা প্রশ্ন তোলে না কোন যাদুবলে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি তৈরি করে কংগ্রেস দল— সেই বিষয়ে। তবে কী সাংবাদিকের সত্যনিষ্ঠা কোন বিশেষ খুঁটিতে বাঁধা?

—রাজু হালদার, হালাড়া, জামালপুর, বর্ধমান।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্বামী প্রণবানন্দ

১৫ শ্রাবন, ১৮ (১.৮.২০১১) সংখ্যায় সাধন কুমার পাল মহাশয়ের লেখা ''সমৃদ্ধ ভারত ও সন্ন্যাসী বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তা'' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে— ''বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা পড়াশুনা মুলতুবী রেখে তিনি সেবাব্রতী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বন্যাত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হাত পেতে সাহায্য তুলেছেন আর্ত মানুষের জন্য''—খুব সত্যি কথা, কিন্তু সামান্য ঘটনা বাদ পড়ে গেছে। তা হলো সেবাকার্য করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুব বিরক্ত হলেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন বিনোদ সাধু নামে একটি যুবক তাঁর অনেক স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ওই সেবাকার্য পরিচালনা করছেন। সেই সাধুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং ছাত্রছাত্রী সকলকে ফেরত পাঠিয়ে ওই নবীন বিনোদ সাধুর উপর সমস্ত সেবার কাজ ন্যস্ত করেন। ইনিই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বরেণ্য প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ।

—জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস, দৌলতপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত এত অবহেলিত কেন ?

ড. প্রণব রায়

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের নূতন মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী উভয়েই খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন, এটা খুবই আশার ও আনন্দের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বতন প্রেসিডেন্সি কলেজে আগে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া বাকী সববিষয়েই পড়াশুনা করত। আমাদের ছাত্রাবস্থাতেও সেই ব্যবস্থা ছিল। নামকরা সব অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ অলংকৃত করতেন, এটা প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু সি পি এম পরিচালিত বাম সরকারের আমলে দীর্ঘকাল কলেজের পঠনপাঠনের এত অবনমন হয়, যে ভালো ছাত্রেরা আর ওই কলেজে ভরতি হতে চাইত না। তবু নামের জোরে ভরতি হওয়ার চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু মানের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আর পাঁচটা সাধারণ কলেজের সঙ্গে এর পার্থক্য তেমন কিছু ছিল না। এর একটা কারণ, উন্নত মানের অধ্যাপক নিয়োগে বামশাসনের অনীহা। কারণ দলতন্ত্র কলেজে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শুধুমাত্র পড়াশুনা ও গবেষণা করা অধ্যাপক নিলে চলে না। শাসক বাম সিপিএম দলকে কলেজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অনেকবার বলেছেন, কলেজ ও স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে দীক্ষিত করা প্রয়োজন। এটা বাম জমানার দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের মধ্যে অন্তত ৩০ বছর ধরেই শুরু হয়েছিল। তবে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির প্রবল দাপট অন্তত দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চলে আসছে। নতুন সরকার ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেসিডেন্সি (কলেজ) বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করে প্রকৃত জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে এই কলেজের উন্নয়নের জন্য যে উচ্চ কমিটি গঠন করেছেন, তা অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য।

এই প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আর যে কলেজটির উল্লেখমাত্র করা হলো, সেই সংস্কৃত কলেজ কলকাতার একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ, যেটি এখন শিক্ষাবিদদের চোখ এড়িয়ে কোনওক্রমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে আমার দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বলা যায়, সংস্কৃত কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো সে যুগে শুধু সংস্কৃত শিক্ষায় নয়, নানা বিষয়ে বাংলার গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্বরূপ হিন্দু কলেজ ১৮১৭ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও (যার পঠন-পাঠন হোত বর্তমান হিন্দু স্কুলের পার্শ্ববর্তী এখন 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ' ভবনে) প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে। হিন্দু কলেজ উঠে যায় ১৮৫৪ সালে।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৪ খৃস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। প্রথমে ক্লাস শুরু হয়েছিল ৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে। হিন্দু কলেজ ১৮১৭-র ২০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিৎপুরের একটি বাড়িতে ছিল। সেখানেই ছাত্রেরা পড়াশুনা করত।

প্রাক্তন 'পটলডাঙা স্কোয়ার' বা গোলদীঘির উত্তর পাশে সংস্কৃত কলেজের জন্যে যে বিরাট 'দালান' তৈরির উদ্যোগ করা হলো, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮২৪ এর ২৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮২৬ সালের ১ মে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়। তার দু-পাশে হিন্দু কলেজের স্থান হয়। ক্লাশ চলতে থাকে। এখানেই ডিরোজিও প্রমুখ অধ্যাপক ক্লাস নিতেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' গ্রুপ এখানে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৮২৬ সাল থেকে সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন আজও এই বাড়িতে চলে আসছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কলেজের ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক— একাধারে ছাত্র, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। কলেজকে তিনি শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থানে পরিণত করেননি, বাংলাদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের একটি পীঠস্থানেও পরিণত করেন। বিদ্যাসাগর নিজে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে আরও অনেক ব্যক্তিত্ব এখানেই পাঠ গ্রহণ করে একনিষ্ঠ ভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে সচেষ্ট হন— শিবনাথ শাস্ত্রী, তারাশংকর তর্করত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আধুনিক কালের সুকুমার সেন এবং আরও অনেকে। বাংলার নবজাগরণের অনেক নেতা এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। ১৮৬০ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসার পর এই কলেজ থেকে বহু কৃতবিদ্য মেধাবী ব্যক্তি দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক যুগে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী পণ্ডিতেরা এই কলেজের প্রভূত উন্নতি করেন। হিন্দু কলেজের সম্পাদক হোরেস হেম্যান উইলসন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। প্রধানত, তাঁর উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের প্রথম সম্পাদক বা সেক্রেটারি হন জন প্রাইস। ১৮৫১-৫৮ বিদ্যাসাগর প্রথম অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হলেও পরে ইংরাজি বিভাগ চালু হয়।

চিকিৎসাবিভাগ সংস্কৃত কলেজেই প্রথম স্থাপিত হয়। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী মধুসূদন গুপ্ত এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। তিনি এখানেই চিকিৎসা-বিদ্যার পাঠ নিতেন। একালের প্রসিদ্ধ কবি বিষ্ণু দে সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র ছিলেন।

কিন্তু সংস্কৃত কলেজ আজ নিতান্তই অবহেলার সামগ্রী। লক্ষাধিক গ্রন্থ ও প্রাচীন পুঁথি এখানের পাঠাগারকে সুশোভিত করলেও অযত্ন অনাদরে সেগুলির তেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না। এই কলেজেই রয়েছে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহশালা'। বহু প্রত্নবস্তুর আগার। সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগে সমস্ত কলাবিভাগের বিষয় পড়ানো হয়। স্নাতক ছাড়া কয়েক বছর আগে স্নাতকোত্তর বিভাগও খোলা হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো এখানেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে রাজনীতির। এখানের একটি ঘরে সিপিএমের কো-অর্ডিনেশন কমিটির অফিস হয়েছে বহুকাল আগে। সংকীর্ণ রাজনীতি কলুষিত করেছে এই কলেজকে। কলেজের সংলগ্ন পুরানো হিন্দু কলেজের বাড়িতে 'সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদে'র (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে) অবস্থা আরও করুণ। এই পরিষদের অধীনে পশ্চিমবাংলার টোল বা চতুষ্পাঠীর পরিচালনা, মাসিক ভাতা মঞ্জুর করা ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব থাকলেও অর্থাভাবে তা সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে না। টোলের পণ্ডিতেরা নিয়মিত যৎসামান্য ভাতা বা বৃত্তি পান না। ছাত্রছাত্রীরা যথাসময়ে পরীক্ষা না হওয়ায় টোলে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। সংস্কৃত কলেজে টোলবিভাগ প্রায় উঠে গেছে। যেখানে এককালে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরের লেখক ছিলেন, তারপর জয়গোপাল তর্কালংকার, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, মদনমোহন তর্কালংকার, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার প্রমুখ সেকালের খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা অধ্যাপকপদ অলংকৃত করতেন, সেই টোল বিভাগ আজ প্রায় লুপ্ত। গবেষণা প্রকাশন বিভাগ ও গবেষণা বিভাগ অর্থাভাবে লুপ্ত।

অথচ সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে বহু চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হয়েছেন। এই কলেজ পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্য। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলেও এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি। সংস্কৃতের বর্তমান দুর্দশা দেখে কোনও কোনও শিক্ষাবিদ সংস্কৃত কলেজকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সুপারিশ করেন। এই কলেজের (প্রাক্তন ছাত্র ও বিদগ্ধ অধ্যাপক) প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দিলীপকুমার কাঞ্জিলালের উদ্যোগে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৯২-৯৩-এ সরকারের তরফে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ড. কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় দুবার কলেজ পরিদর্শন করেন। তখন খুব উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। তাঁর ভালো রিপোর্ট সরকারের কাছে দেওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজ আজও বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারেনি। এটা কি ভারতের একটি প্রাচীন গৌরবময় ভাষার প্রতি শুধুমাত্র অবহেলা, না অন্যকিছু? যে ভাষায় অমূল্য সম্পদ বর্তমান, তার পীঠস্থান যে সংস্কৃত কলেজ, তার এমন অবস্থা কেন? কেন সংস্কৃত টোলগুলি আর্থিক দৈন্যে জীর্ণ শীর্ণ, অবলুপ্তির পক্ষে? কেন টোলের দরিদ্র পণ্ডিতেরা সামান্য ভাতা ছাড়া নিয়মিত বেতন পান না? সংস্কৃত কলেজকে বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা কোনওমতেই সফল হচ্ছে না কেন?

জনপ্রিয় নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য এবং সংস্কৃত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আমাদের অনেক আশা, তা নিশ্চয়ই ফলবতী হবে।

ত্রিভাষা

সম্প্রতি এই পত্রিকার এক পাঠক সংস্কৃত ভাষাকে বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য করিবার আবেদন জানাইয়াছেন। ('বিদ্যালয়ে সংস্কৃত আবশ্যিক হোক', ৮-৯) প্রস্তাবটি মূল্যবান। সংস্কৃত যে ঐতিহ্যপূর্ণ এক সাহিত্যভাণ্ডারের প্রকাশ মাধ্যম, জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারক তাহা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে একদা আগমার্কা জনদরদি বামেরা ভাষার প্রশ্নে বৈপ্লবিক সংকীর্ণতা জারি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপ্লববাদী দরদিয়া চক্ষে ইংরাজি কেবল উপনিবেশের প্রভুদের ভাষা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল আর তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সংস্কৃত বুঝি কেবল পুরোহিততন্ত্রের ভাষা। ফলে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে নিকেশ করিয়াছিলেন। সর্বস্তরে সহজিয়া এক ফাঁকিবাজি কায়েম হইয়াছিল। জ্ঞানের অবনমন ঘটিয়াছিল। বঙ্গবাসী তাহাদের ভাষা শিক্ষার ঐতিহ্য ভুলিয়াছিল। এ ক্ষণে ইংরাজির প্রয়োজন বঙ্গজগণ টের পাইয়াছেন, যেমন করিয়া পারেন তাহা শিখিবার প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু সংস্কৃতের প্রতিও মনোযোগ আবশ্যক। পাশ্চাত্যে ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান— এই তিন ভাষা জানা শিক্ষিত মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে সহজেই চোখে পড়ে। ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা— এই তিন ভাষাই বা শিক্ষিত বাঙালি জানিবেন না কেন! একদা তো জানিতেন।

শুধু বিদ্যালয় স্তরে নহে, উচ্চশিক্ষায় কতকগুলি বিষয় পড়ার জন্য সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের জ্ঞান আবশ্যক। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পড়ুয়াদের সংস্কৃত না জানিলে চলিবে কেন! প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা জানিতে হইলে সংস্কৃতে রচিত মূল গ্রন্থাদি পড়িতে হইবে। বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতিই বা কেমন করিয়া সংস্কৃত ছাড়া জানা সম্ভব! যদুনাথ সরকার একটি পত্রে প্রাচীন ইতিহাসের পড়ুয়াদের সংস্কৃত পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা—সাহিত্যের শ্রুতকীর্তি অধ্যাপকরা সচরাচর সংস্কৃতে পারঙ্গম। ফাঁকিবাজি করিয়া যে উচ্চশিক্ষিত হওয়া যায় না, এ কথা স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে।

আর এক দিকও বিবেচনাযোগ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভাষণে উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃতকে গ্রিক ও লাতিন ভাষা অপেক্ষাও উন্নততর বলিয়াছিলেন। আধুনিককালে ভাষাবিদরা সকল মানবভাষাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। কোনও ভাষাই কম মর্যাদাপূর্ণ নহে। সত্য কথা। তবে একটি ভাষা অপর ভাষার তুলনায় ব্যাকরণগত দিক দিয়া অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে। পুরাতন ভাষাবিদরা ও অধুনা গণকযন্ত্রবিশারদরা দেখাইয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিনির্ভর। পাণিনি এই ভাষাকে যে নিয়মের সীমায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণবিন্যাস হইতে শুরু করিয়া ব্যাকরণের নিয়ম, সর্বত্র এক সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক কাঠামো ক্রিয়াশীল। কাজেই, সংস্কৃত চর্চা করিলে যুক্তিবোধের চর্চাও হয়। যে ভাষার এত গুণ তাহাকে আমরা বাদ দিব কেন! পূর্বজদের পঠিত সংস্কৃত ব্যাকরণের বইগুলির ধুলা সরাইবার দরকার নাই, প্রয়োজনে নূতন বই নির্মাণ করিতে হইবে। ভাষা শিখিয়া বঙ্গজগণ সুসংস্কৃত হউন।

[সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০.৯.১১]

তর্পণে পিতৃপুরুষদের তৃপ্তি

নবকুমার ভট্টাচার্য

মহালয়ায় পিতৃপক্ষের শেষে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণের রীতি। মহালয়া দেবীপক্ষের প্রারম্ভে মহাপুজোর সূচনাও বলা যায়। তর্পণ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো তৃপ্তি। দেবতা ও পরলোকগত পিতামাতা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের তৃপ্তি সাধনের জন্য গঙ্গা বা নদীতে তাঁদের উদ্দেশে তিলজল সহ অর্চনাকে তর্পণ বলা হয়। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে অমাবস্যা তিথি অর্থাৎ মহালয়া পর্যন্ত পিতৃপক্ষ।

যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রমতে সমস্ত পরলোকগত আত্মার একত্রিত ও সমবেত হবার বিশেষ দিন এই মহালয়ার পুণ্য তিথি, সেজন্য এই দিনটিকেই তর্পণের জন্য শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত করা হয়েছে। এই তিথির মূল উদ্দেশ্য পুজো বা শ্রাদ্ধ। আশ্বিনের এই প্রেতপক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যলাভে পিতৃপুরুষেরা অসামান্য তৃপ্তি অনুভব করেন। এই শ্রাদ্ধক্রিয়ার পরম পবিত্র দিনই মহালয়া। মহালয়া অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ ভোজ্য পিণ্ড তর্পণাদি করে ষোড়শ পিণ্ডদানের বিধি রয়েছে। এই ষোড়শ পিণ্ডের দ্বারা পরিচিত মৃত সকলের তৃপ্তি সাধিত হয়। অন্যান্য সকল দিনে শ্রাদ্ধ তর্পণাদির ব্যবস্থা থাকলেও ষোড়শ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা একমাত্র মহালয়া অমাবস্যাতেই রয়েছে।

পৌরাণিকযুগে মহালয়া নামে একদেবীর সন্ধান মেলে যা আসলে বিষ্ণুরই মোহিনীরূপ। বিষ্ণু মোহময়ী মোহিনীরূপে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের মধ্যে সেদিন সমুদ্র মন্থনজাত অমৃত পরিবেশন করেছিলেন। বঞ্চিত অসুরদের ভাগ্য সেদিনই নির্ধারিত হয়ে যায় অর্থাৎ তারা মহালয় প্রাপ্ত হয়। আর দেবী পরিচিতা হন মহালয়া নামে। মহালয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ মহা+আলয়। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শব্দটি স্ত্রীবাচক হওয়ায় দিনটির নাম হলো মহালয়া। আবার ব্যাকরণগত ভাবে 'মহ' শব্দের অর্থ উৎসব। এই পিতৃপক্ষে পরলোকে পিতৃগণের বিশেষ উৎসবের আলয় বলে খ্যাত। অর্থাৎ পিতৃপুরুষেরা এই সময় পরলোক থেকে মর্তলোকে আসেন। নিজের গৃহের পরিবেশে নিকট আত্মীয়ের কাছাকাছি। যদি তাঁদের বংশধরেরা তৃপ্তি সাধনের জন্য পিণ্ডদান না করেন? জলদান না করেন কিন্তু তাঁদের রক্ষিত সম্পদ অনায়াসে উপভোগ করতে থাকেন— তখন তাঁরা নিরাশ হয়ে গভীর অনুতাপের সঙ্গে বংশধরদের অভিশাপ দিতে দিতে আবার স্বস্থানে চলে যান।

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে পূর্বপুরুষদের প্রতি কিছু ঋণ ও দায় নিয়েই জন্মাই আমরা। তর্পণের মাধ্যমে সেগুলো পরিশোধ করতে হয়। বায়ুপুরাণে রয়েছে— তর্পণ যথা সময়ে অর্পিত না হলে তাঁরা নাকি জলাভাবে সন্তানের রক্ত শোষণ করে থাকেন। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডেরও রয়েছে— ইন্দ্রের সারথি মাতলির প্রশ্নের জবাবে স্বয়ং মহাদেব বলেছেন, মানুষ যদি আর কিছু না হোক অন্তত সামান্য জলতিল দিয়েও তার পূর্বপুরুষদের তর্পণ না করে তাহলে তাকে নরক ভোগ করতে হয়। মানুষের মৃত্যু হলেও আত্মা অমর। আত্মার বিনাশ নেই। তাই তর্পণে শ্রদ্ধাসহকারে যা অর্পিত হয় তা মন্ত্রের প্রভাবে পিতৃপুরুষ যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠেয় বলেই শ্রাদ্ধ নামটির এত সার্থকতা। পূর্বপুরুষের আত্মাকে স্বর্গীয় সুস্থিতি দিতে তর্পণ একটি অবশ্য কর্তব্য ক্রিয়া।

রামায়ণে দেখা যায়, ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যুসংবাদ শুনে রামচন্দ্র কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে করে চিত্রকূটের পাদদেশে প্রবাহিত মন্দাকিনী নদী তীরে গেলেন, স্বর্গত পিতার উদ্দেশে তর্পণ করার জন্য। সেখানে অঞ্জলি ভরে জল দিয়ে নিবেদন করলেন। মহাভারতেও রয়েছে— কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৌরব বংশের স্বামী পিতা ভ্রাতা পুত্র ও স্বজনহারা কুরুকুলের রমণীরা পাণ্ডবদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেলেন তর্পণ করতে। সেখানে তাঁরা আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আত্মীয়স্বজন ও বীরদের উদ্দেশে তর্পণ করলেন।

তর্পণের একাধিক নিয়ম, মন্ত্র, আচার, উপাচার এক একটি দিক নির্দেশ। সর্বপ্রথম তর্পণ করতে হয় দেবতাদের— ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্র এবং প্রজাপতি। এরপর রয়েছে মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ, যমতর্পণ, ভীষ্মতর্পণ ইত্যাদি। তর্পণে যে সমস্ত মন্ত্র রয়েছে তা যে কত উদার ভাবলে ঋষিকুলের কাছে আমাদের মাথা নত হয়। মানবতার চেতনা মিশে রয়েছে মহালয়ার তর্পণের মন্ত্রে। তর্পণ বলতে কেবল নিজের পিতৃপুরুষ পিতা পিতামহ নয়, বলা হয়েছে—। 'অতীত কুল কোটিনাং, সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাম্' অথবা 'যে বান্ধবা অবান্ধবাঃ বা যে অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ' তাঁকেও আহ্বান করা হয়। আমাদের ধর্মানুশীলন সঞ্জাত উদার অনুভূতিরই পরিণতি এটা। অনন্তকাল ধরে এই ভারতভূমির কোটি কোটি মানুষ পিতৃপক্ষের দিনগুলিতে ঐমন্ত্র উচ্চারণ করে তিন গণ্ডুষ জল অঞ্জলি দিয়ে স্মরণ করে চলেছেন তাঁদের বিদেহী পিতৃপুরুষদের। এখানে কোন জাতপাত নেই, কোন শ্রেণী বৈষম্য নেই। নেই কোনও পরিবারিক সংকীর্ণতা। 'তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্' বলে স্বর্গ মর্ত্য পাতালের তিন ভুবনকে একই সঙ্গে স্মরণ ও বরণ করা হয়। সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন এই চেতনা। এই অখণ্ড মানবতার দিক মহালয়ার তর্পণের মধ্যে নিহিত আছে বলেই শুধু পিতৃপুরুষের নয়, যারা আমাদের কেউ কোনওদিনও ছিল না তাদেরও স্মরণ করি। আমাদের মনের এই ঔদার্যকে তুলে ধরার জন্যই প্রত্যেক বছর এই দিনটিকে আমরা চোখের জল ফেলে মন্ত্র পড়ি। এই পিতৃপক্ষে পিতৃতীর্থ গয়ায় জমে ওঠে পিতৃপক্ষের মেলা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই সময় গয়ায় যান পিতৃতর্পণ ও পিণ্ডদান করতে। মহালয়ার পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় দেবীপক্ষ। অর্থাৎ পিতৃবন্দনার পরই দেবীবন্দনা। প্রকৃতির আওতায় অসুরের কবল থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন ভগবতী দুর্গা।

ইউরোপের দেশে দেশে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড

।। পর্ব — ২।।

হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ

বেলা একটার সময় আমরা ব্রাসেলস থেকে প্যারিসের (Paris) পথে রওনা হলাম। ব্রাসেলস্ থেকে প্যারিসের দূরত্ব প্রায় ৩২০ কিলোমিটার। সেইন নদী প্যারিসের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। প্যারিস তো বিশ্বের একটা অন্যতম সুন্দর শহর। আর বলতেই হবে এই সেইন নদী তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বিকেলে প্যারিসে পৌঁছলাম। সেখানে Hotel Forest Hills Meudon-এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

আমরা জয়পুরকে Pink City বলে থাকি। তাহলে প্যারিসকে বলতে হয় 'City of White Marble'। প্যারিস শহরে ১৫০টা ভারতীয় হোটেল রেস্টুরেন্ট আছে। সেইন নদীর তীরে 'National Assembly House' অবস্থিত। বিকেলে আইফেল টাওয়ার দেখার পরে অনেকেই স্টীমারে করে সেইন নদীতে Boating করতে গেল। কেবল আমরা ১০ জন বোটিংয়ে না গিয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়িয়ে ঘণ্টা দু'য়েক কাটিয়ে দিলাম। পরদিন প্যারিস ছেড়ে Caley (ক্যালে) অভিমুখে যাত্রা করলাম। আমাদের ভারতবর্ষে রাত্রি ৪টের সময় যেমন প্রকৃতির দৃশ্য থাকে তেমনই ঠিক সকাল ৭টার দৃশ্য এখানে দেখছি। যেন, রাতের অন্ধকারে আমরা প্যারিসকে বিদায় জানাচ্ছি। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের বর্ডারে পৌঁছালাম। এখানে আমাদের Passport এবং Emigration Certificate পরীক্ষা করা হলো। ফ্রান্সের বর্ডারের নাম Caley এবং ইংল্যান্ডের এই বর্ডারের নাম Frankstone। সেখান থেকে মেডস্টোনে পৌঁছালাম। এখানে দুপুরের আহারাদি শেষ করে লন্ডনের পথে রওনা হলাম। প্যারিস থেকে লন্ডনের দূরত্ব ৪৮০ কিলোমিটার। টেমস নদীর ফটো তোলা হলো। আমরা লন্ডনে প্রবেশ করলাম। আমরা বাসে করেই Central London, Central London Square, House of Common's West Minister Hall, দেখলাম। তারপরে আমরা Quality Hotel Wembly তে গেলাম। সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

লন্ডন শহর খুব সুন্দর শহর, যে ক'টা দেশ দেখলাম তার মধ্যে লন্ডন খুব ব্যস্ত শহর। ইউরোপের শহরগুলিতে দোতলা বাস আছে। কিন্তু লন্ডনের বাসগুলিতে আবার দোতলার ছাদেও

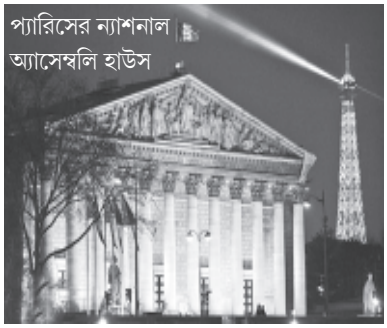
প্যারিসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি হাউস

বসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার উপরে কোনও Shed নাই।

এবার আমাদের ফেরার পালা। Airport থেকে Dubai Air Port, সেখানে আমরা তিনজন একটা বেঞ্চে বসে গল্প করছি। এমন সময় আমাদের পাশে এসে বসলেন একজন, বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম না। হঠাৎ তিনি বললেন নমস্তে। তাকিয়ে দেখলাম তিনি একজন ইসকনের সাহেব সাধু। বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হবে। বললাম, কোথায় যাবেন? উনি বললেন, ভারতে। আপনার বাড়ী কোথায়? বললেন, আমস্টারডাম।

আমাকে বললেন— আপনি বাংলাতে বলুন। অল্প অল্প বুঝতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'বাংলা শিখলে কি ক'রে? ও বললো— মীরার ভজন করি যে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভজনের অন্তর্নিহিত মানে বুঝতে পারো? ও বললো, অনুভব করি। এই বলে ঝোলা থেকে একটা লাড্ডু বার করে সকলের হাতে দিয়ে বললো,

মহাপ্রভুর প্রসাদ।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—

তোমার বাড়ীতে কে আছেন?

বললো, মা এবং বাবা। তাঁরা রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান, প্রচণ্ড গোঁড়া।

তোমার অসুবিধা হয় না?

ওঁরা ওঁদের মতো রান্না করে খান। আমি আমার মতো চাল, ডাল, সবজি সিদ্ধ করে খাই।

আমস্টারডামে প্রভু জগন্নাথদেবের এবং ইসকনের রাধাকৃষ্ণের মন্দির হয়েছে। নাটমন্দিরে প্রাথমিক টোল আছে। সেখানে সংস্কৃত এবং ধর্মীয়গ্রন্থ পড়ানো হয়। বাইশ হাজারের মতো ইসকনের অনুরাগী আছেন। সেখানে আমরা হিন্দুদের প্রায় সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকি। একজন সাহেব বাংলাতে কথা বলছে দেখে অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখছেন। একটা মীরার ভজন গান করে শোনাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন তোমার নাম কি? বললো, ব্রজবিহারী দাস। আমি বললাম, ব্রজবিহারী কে জান? বললে জানি। ভারতে কতদিন থাকবে? কোথায় যাবে? বললে মথুরাতে যাব, ১৩ দিন থাকবো। এখন যে মথুরাতে গোপাষ্টমী উৎসব আরম্ভ হবে। সময় হলে মায়াপুর এবং নবদ্বীপে যাব, তিনি বললেন।

সুদূর ইউরোপ থেকে ভারতে আসছে। তার পোশাক হাতকাটা ফতুয়া, ছোট ধুতি। দুটোই ফিকে গোলাপী রংয়ের। কপালে চন্দনের টিকা, গলায় কণ্ঠির (তুলসীর) মালা, ন্যাড়া মাথাতে টিকি, ঘাড়ে ঝোলা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

দুবাই Air Port থেকে Emirates Air Service Flight No. EK-16-এ আমরা দিল্লির জন্য রওনা হলাম। বিমানে আমাদের সামনের রোতে ওই ছেলেটির বসার জায়গা দেখে আমাদের খুব আনন্দ হলো। দেখলাম বিমানের ফলের রস ছাড়া ওই ছেলেটি আর কিছু গ্রহণ করলো না। আমি ওকে বললাম Veg. Meal তো আছে? ও বললো শুদ্ধাচারে তৈরি নয়। তারপরে ও চোখ বন্ধ করে জপে মগ্ন।

পরদিন সকাল সওয়া নটা নাগাদ দিল্লি ইন্দিরা বন্দরে পৌঁছালাম। সন্ধেতে ব্যবস্থা মতো সম্পূর্ণ ক্রান্তি এক্সপ্রেস ধরে হাওড়া। কল্যাণীর বাড়ি পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল। **(সমাপ্ত)**

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

রহস্য পানীয়

১২৫ বছর ধরে পৃথিবীর তৃষ্ণার্তদের মধ্যে কোকাকোলা যে ভুবন- জুড়নো শীতল-তৃপ্তির অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়েছে, তার গোপন ফর্মুলা ও উপাদান আজও রহস্যাবৃত। কোকাকোলার সবচেয়ে বড় ক্রেতা আমেরিকা, যেখানে গড়ে একজন আমেরিকান বছরে ৫০ গ্যালন কোক পান করেন। কোকের কর্মকর্তারা সম্প্রতি এক মজার খবর দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত যত কোকোকোলা উৎপাদিত হয়েছে তা যদি নায়েগ্রা প্রপাতের বিস্তীর্ণ অংশে ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে সব পানীয় শেষ হতে নাকি সময় লাগবে ২০ ঘণ্টা।

বাজারে আগুন

'কলকাতার বাজারে আগুন লাগিয়াছে। মাছ-মাংস-ডিমের পাশাপাশি তরকারির আড়তদারের গলাও চড়া। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য যেন মিছিলে সারি দিয়া ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু সাধারণ লোকের মাথায় হাত, চোখে সর্ষেফুল। কাপড়চোপড়ের দাম আগেই বাড়িয়াছে, চিনির স্বভাবও মিষ্টি নহে। মাছ ভাতের বাঙালীর কাছে আজ মাছ তো বিলাস। কাটা পোনা চারি টাকার নীচে নাই— কোনও কোনও দিন পাঁচ টাকাও উঠে।' খবরটি ৫০ বছর আগের (১৬ জুলাই ১৯৬১) একটি ডাকসাইটে দৈনিক পত্রিকার।

সেনসাস

রোমান সভ্যতায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য উপযুক্ত পুরুষদের যে নামের তালিকা তৈরি করা হোত তাকে বলা হোত সেনসাস। বর্তমান কম্পিউটার পাঞ্চকার্ডের হাতেখড়ি হয় এই সেনসাস দিয়েই। এই প্রযুক্তি সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একদল ডাকাত, যারা সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে মিশে থেকে লুটপাট চালাত। এদের শনাক্তকরণের জন্য সব যাত্রী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। শুরু হলো টিকিটের মধ্যে রকমারি ছিদ্রের মাধ্যমে যাত্রীর চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে রাখার আধুনিক পদ্ধতি। হারমেন হলারিথ নামে এক মার্কিন পরিসংখ্যানবিদ এই পদ্ধতিকেই জনগণনার কাজে লাগান।

'আঃ' 'উঃ' নামে নদী ও শহর

আঃ উঃ শব্দ দু'টি বিস্ময়সূচক বা খেদোক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ফরাসি দেশে শব্দ দু'টির ব্যাপ্তি অন্য অর্থেও। 'আঃ' হলো ফরাসি দেশের একটি নদীর নাম, যে নদী ফ্রান্সের পা-ডি-ক্যালে নামক অঞ্চলে প্রবহমান। আর 'উঃ' নামে একটি শহর ও হ্রদ আছে দক্ষিণ ফ্রান্সের হাউতে গারোনেতে।

এমু পাখি চরৈবেতি

এমু পাখি আর ক্যাঙারু পেছন দিকে হাঁটতে পারে না। তাই অস্ট্রেলিয়ান সেনাদের উর্দিতে এমু ও ক্যাঙারুর লোগো ব্যবহার করা হয়, যাতে সেনারা শুধু এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায়—চরৈবেতি!

রঙ্গকৌতুক

প্রশ্ন : গড়বেতার পার্টি অফিসে কি অ্যানাটমির ক্লাস নেওয়া হোত?
উত্তর : না না, গুটি বসন্তের চিকিৎসা হোত।

***

সুজয় : সোনার দাম কেন আকাশছোঁয়া হচ্ছে রে?
উদয় : মেয়েরা যে-হারে যেচে যেচে গলায় শেকল পরে চলেছে সোনার দর বাড়বে না তো কী?

***

—বন্যা কেন হয়?
—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য।

***

বন্ধু-১ : সিপিএম-এর গৌতম দেব বলেছেন, ফ্রন্টের বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে দলে চুলচেরা বিচার চলছে।
বন্ধু-২ : চুলচেরা, না গৌতম দেবের চুল ছেঁড়া চলছে?

***

প্রশ্ন : জোড়া খুনের দাগী আসামী হাতকাটা দিলীপ আর তার সাগরেদদের কোন্ আক্কেলে হাইকোর্ট বেকসুর খালাস করে দিল?
উত্তর : বামফ্রন্টে নেতা-কর্মীদের আকাল পড়েছে বলে আদালত তো অবিচার করতে পারে না!

***

ছেলে : মা তুমি মোবাইল ফোন ব্যবহার কর না কেন?
মা : আমি যে মনেপ্রাণে ল্যান্ডমাইন বাবা, নড়তে চড়তে পারি না।

***

—ছিন্ন জন-সংযোগ জুড়তে সিপিএম এখন কী করবে?
—সাত বছরের শিশুর কাটা হাত জুড়ে-দেওয়া ডাক্তারকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। রামায়ণ-মহাভারতে গুপ্তচরকে কী নামে বর্ণনা করা হয়েছে?
২। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী, যাঁকে ভালবেসে লোকে 'সর্দার' বলে ডাকতেন। কে তিনি?
৩। একজন বিদেশি চিকিৎসকের নামে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের একটি অসুখের নামকরণ করা হয়েছিল। এই চিকিৎসক?
৪। রাহুল দ্রাবিড়কে তাঁর সতীর্থরা কী নামে ডাকেন?
৫। বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি প্রথম কোন্ শিল্প-রীতিতে তৈরি হয়?
৬। 'তখ্‌ত-এ-তাউস' আমাদের কাছে কী নামে পরিচিত?
৭। মানবদেহে কোন্ ধাতু সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়?

—নীলাদ্রি

উত্তর : ১। চক্ষুকর্ণ, ২। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ৩। জার্মান চিকিৎসক অ্যালহস অ্যালঝাইমারের নামে অ্যাল্‌ঝাইমার্স রোগ, ৪। জ্যামি, ৫। গান্ধার, ৬। ময়ূর সিংহাসন, ৭। ক্যালসিয়াম

ঠাকুরমা সম্মেলন

ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর পরম্পরাগত প্রকৃত মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ শিশু মন্দির ২২ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। এই সংস্কৃতিকে সজীব রাখতে প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী ঠাকুমাদের নিয়ে এক সম্মেলন গত ৩১ আগস্ট মালদা জেলার মঙ্গলবাড়ী বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মুক্তিপ্রদা সরকার। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্ন্যাসিনী কেতকী পুরী এবং গায়ত্রী পুরী। ১৬২ জন ঠাকুমার উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মা সরস্বতীর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

বয়স হয়েছে বলে টি. ভি. দেখে সময় নষ্ট না করা, পরকালের জন্য নিজেকে ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখা, বৌমার ওপর খবরদারী নয়— সুন্দর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সংসারের কর্তব্য তাকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সামাজিক কাজে নিযুক্ত রাখা প্রভৃতি বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ও সন্ন্যাসিনী কেতকী পুরী।

শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার বলেন— পরিবারের মূল ঠাকুমা, কাণ্ড ঠাকুরদা। অতএব মূলকে ঠিক রাখতে হবে। পরিবার টুকরো না হয়ে যায় ও বৃদ্ধাবাসে না থাকতে হয়, সেইমতো ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পাশ্চাত্যের প্রভাবে বৃদ্ধাবাসের সংখ্যা বাড়ছে, যা এই সমাজ তথা মানুষের কাছে খুবই দুঃখজনক। শান্তি পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হাসনাবাদে দন্ত পরীক্ষা শিবির

সমাজসেবা ভারতীর উদ্যোগে বসিরহাট জেলার হাসনাবাদ মহকুমার কুলিয়াডাঙা শাখায় দন্ত চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল গত ৫ সেপ্টেম্বর। ডাঃ পিয়াল স্নিগ্ধ দাস (দন্ত বিশেষজ্ঞ) চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সেবা প্রমুখ সুখেন্দু মণ্ডল, জেলা সহ-কার্যবাহ তারকনাথ ঘোষ ও হাসনাবাদ মহাকুমা সম্পর্ক প্রমুখ দেবব্রত দাস সহ অনেক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এই বর্গে ৫০ জনের দাঁত উঠানো হয়েছে। তাছাড়াও গ্রামের অনেক ব্যক্তিকে দাঁত নিয়ে সজাগ করে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

দুর্নীতিবিরোধী সভা

গত ২৪ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহর জেটিয়া বাজারে আন্না হাজারে ও রামদেবজীর দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে একটি পথ সভা হয়। পরিচালনায় রামপ্রসাদ মঠ ও মিশন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানের বক্তারা ছিলেন ডঃ জিষ্ণু বসু, অসিতবরণ আইচ, লালমোহের পাণ্ডে ও অশ্বিনী জয়সওয়াল প্রমুখ। সভাপতি ছিলেন পল্টন সিন্‌হা।

সমাবেশ সমাচার

মঙ্গলনিধি

সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক বাসুদেব ঝুনঝুনওয়ালার ভাইপো কলকাতা নিবাসী অতুল কুমার আগরওয়াল তাঁর কন্যা আদৃতির তৃতীয় জন্মবার্ষিকীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়োজিত সংগঠন 'সক্ষম'কে ২১০০ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে দান করেছেন।

সাড়ম্বরে পালিত সংস্কার ভারতীর রজতজয়ন্তী স্মারক অনুষ্ঠান

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।। গত ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় উত্তম মঞ্চে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার রজতজয়ন্তী স্মারক অনুষ্ঠান ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। বলে রাখা ভাল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৮১ সালে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হলেও এ রাজ্যে সংস্কার ভারতীরা কর্মকাণ্ড ১৯৮৭ সালেই সূচিত হয়। এমন একটি সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক ও ভারতীয় ভাবধারায় দায়বদ্ধ সংস্থার রজতজয়ন্তী পালন করা সত্যিই একটি গর্ব করার মতো সন্ধিক্ষণ। একথা আমাদের মতো কোনও প্রতিবেদকের বলার অপেক্ষা যে রাখে না তা এদিনের অনুষ্ঠানে সমাগত শিল্প সংস্কৃতির নানান অঙ্গনে স্বনামধন্য ব্যক্তিরা অকপটে স্বীকার করে গেলেন। সভাপতি ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ও শুরু হয়— তাই দেশজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হওয়ার ক্ষেত্রে সংস্কার ভারতীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীমতী বাণী বসু এই সংস্থার দীর্ঘকালীন আদর্শনিষ্ঠতায় তাঁর মুগ্ধতা ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। অনুষ্ঠানের শুরুর দিকেই জনপ্রিয় শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য প্রায় খালি গলায় ইমন কল্যাণ রাগে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটির দরদী পরিবেশনায় অনুষ্ঠানের সুর বেঁধে দেন। প্রলম্বিত অনুষ্ঠানে ছিল বহু গুণীজনকে সম্মাননা জ্ঞাপন ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত নিবেদন। যেমন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবীণতমা ও প্রতিভাময়ী নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র ও নাট্যজীবনের একটি আলেখ্য পাঠ ও সঙ্গে তাঁর অভিনীত কালজয়ী কিছু ছায়াছবির খণ্ডাংশের এক অভিনব ও অনবদ্য স্লাইড প্রদর্শন। সাবিত্রী দেবীও বাহ্যত অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রবীণ আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত মজাদার ছড়া পরিবেশনে মুহূর্তে অনুষ্ঠানের আবহে একটু মিঠে বাতাস বইয়ে দেন। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র আবৃত্তি ও বুদ্ধদেব বসু ও পূর্ণেন্দু পত্রীর স্মৃতি থেকে রবীন্দ্রবর্ণনা অত্যন্ত সময়োপযুক্ত হয়ে ওঠে। বৈচিত্রময় অনুষ্ঠানে কীর্তনাঙ্গের গানে আনন্দী বসুর ''দীনমণির কালো রূপের কি গুণ আমি গাই'' গানটির অন্তর্লীন নিবেদনটি মনকে আপ্লুত করে ও প্রয়াত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি উসকে দেয়। অভিনেতা-গায়ক অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়ের উদাত্ত গলার শ্যামাসঙ্গীত বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একসময়ে সলিল চৌধুরীর সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বিমল চন্দ্র ঘোষের লেখা ''উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'' গানটির আবৃত্তি বিজয়- লক্ষ্মী বর্মনের স্বরক্ষেপণ মাধুর্যে নতুন মাত্রা পায়। দীর্ঘ সম্বর্ধনা তালিকায় আরও ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ মানস চক্রবর্তী, সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস, সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী শ্রীমতী মৌসুমী সাহা, নৃত্যশিল্পী অলকা কানুনগো, প্রখ্যাত ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত যিনি মহিলা ভাস্কর হিসেবে প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান ও মধুসূদন চক্রবর্তী প্রমুখ। আবার দেবদূত ঘোষ, সুদীপ মুখোপাধ্যায় বা সাগ্নিকের মতো একেবারে নবীনদেরও উৎসাহিত করা হয়। এরই ফাঁকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কিছু রূপরেখা তুলে ধরেন যার মধ্যে ২৩, ২৪, ২৫ সেপ্টেম্বর বহুভাষিক সর্বভারতীয় একটি নাট্য উৎসবের পরিকল্পনা। এমন একটি মনোগ্রাহী অথচ আদ্যন্ত রুচিশীল অনুষ্ঠানের সার্থক পরিবেশনার জন্য সংস্থার সহসভাপতি তপন গঙ্গোপাধ্যায়, যুগ্মসম্পাদক নীলাঞ্জনা রায়, সঞ্জয় নন্দী, বিকাশ ভট্টাচার্য, ভরত কুণ্ডু প্রমুখের যৌথ অভিনন্দন অবশ্য প্রাপ্য।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হচ্ছে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে।

স্টারমার্ক অ্যালবামে অভিজিৎ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসঙ্গীত

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।। এই বছরটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ হিসেবে স্মরণীয় করে রাখার একটি শুভ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে তো বটেই অন্যান্য কণ্ঠশিল্পীর মধ্যেও কিছু একটা রেখে যাওয়ার তাগিদ তৈরি করেছে। এমনই একটি প্রথম প্রয়াস করেছেন মুম্বাই-এর প্রবাসী বাঙালী কণ্ঠশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। যিনি অভিজিৎ নামেই বেশি পরিচিত। কেননা সেটাই চালু রীতি,

কুমার শানু ইত্যাদি। অভিজিতের ডি ভি ডি টি ১০টি গান সম্বলিত। প্রত্যেকটিই বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় রবীন্দ্রগান। গত ৭ সেপ্টেম্বর টাইমস মিউজিকের প্রযোজনায় স্টারমার্ক অ্যালবামটির প্রকাশ অনুষ্ঠান করল। বরাবরই একটা প্রথা ছিল কোনও বাঙালী শিল্পী লঘু বা চলচ্চিত্রের গান গেয়ে বিপুল প্রতিষ্ঠা পেলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তত একটি রেকর্ড বা ক্যাসেট না করলে জীবনে কাশী-বৃন্দাবন ভ্রমণ না করার মতো অপূর্ণতা থেকে যেত। ফিল্মি বা বেসিক রেকর্ডে তুমুল জনপ্রিয়তার মধ্যেও অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছুঁয়ে দেখেছেন। তা দোষের কিছু নয়। তবে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের প্রথা-প্রকরণ অনুযায়ী তা কতটা যথাযথ হয়েছে সে বিচার স্বতন্ত্র। তবে তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনও চিরস্থায়ী অবদান হয়তো ততটা রেখে যেতে পারেননি। এর কারণ বহুবিধ। তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অভিজিতের 'ওই আসনতলে' নামাঙ্কিত অ্যালবামটির 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী', 'কেন চোখের জলে' ইত্যাদি গানগুলি আন্তরিকতা ও দরদে ভরা। তাঁর নিজের কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কোনও বাড়তি যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার বা গায়কী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহস তিনি দেখাননি। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিটি ভাল লাগে। তবে দীর্ঘকাল বাঙলার বাইরে কাটানোয় তাঁর স্বরক্ষেপণ ও উচ্চারণের সীমাবদ্ধতা থাকলেও গানগুলি তাঁর নাম ও কণ্ঠের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ভাল লাগতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গানের বহুল প্রচারে তাই বা কম কি?

শব্দরূপ-৫৯৮ কনীনিকা রায়

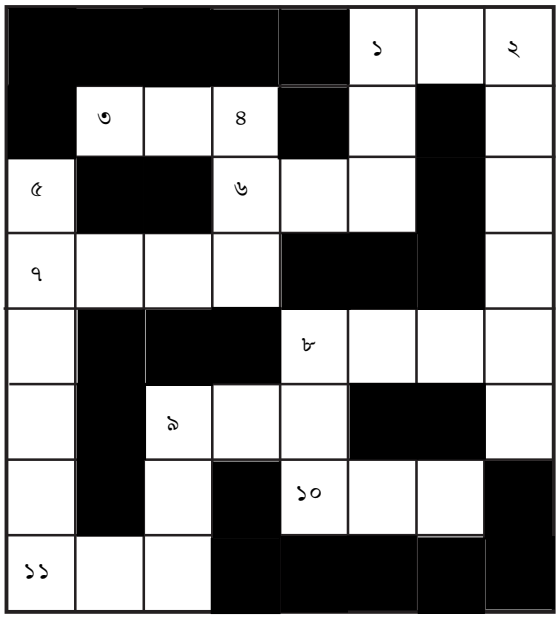

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. প্রতিশব্দে পটুতা, পারদর্শিতা, প্রথম দুয়ে সতীর জনক, **৩.** একই শব্দে বিষ ও বহুমূল্য পাথর, দুয়ে-তিনে মহাদেব, **৬.** সীতার বাবা, **৭.** দেশি শব্দে ঔষধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত শাকবিশেষ, **৮.** পূর্ণিমাতে এই তিথির অবসান হয়, **৯.** মণিবন্ধ, প্রথম দুয়ে খাজনা, **১০.** তৎসম শব্দে বড় মশা, **১১.** ঝঙ্কার, শব্দিতকরণ।

উপর-নীচ ঃ ১. পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ, একে-তিনে পাঁক, **২.** মারীচের মাতা, জম্ভ-দৈত্যের পুত্র সুন্দ অসুরের সঙ্গে এর বিবাহ হয়, তিনে-চারে জেলখানা, **৪.** তৎসম শব্দে রাত্রি, প্রথম দুয়ে ধুলো, **৫.** অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, শেষ তিনে দেবতা, প্রথম দুয়ে মস্তক, **৮.** বিশেষণে কল্যাণকারী, **৯.** শিহরন সমার্থে রাক্ষসরাজ রাবণের অনুচর, রাম-রাবণের যুদ্ধে অঙ্গদের হস্তে নিহত হয়।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

অসীম দে
সাহাপুর, মালদা

আ	ট	কে	■	ন	ষ্ট	চ	ন্দ্র
তা	■	শ	ম্ব	র	■	■	■
■	ল	ব	■	ম	ন্দা	কি	ণী
■	ঙ্কা	■	■	■	■	ম্পু	■
■	প	■	■	■	■	রু	■
বা	তি	দা	ন	■	মে	ষ	■
■	■	■	দে	ব	ন	■	খ
গি	রি	ব	র	■	কা	না	ই

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ২৩

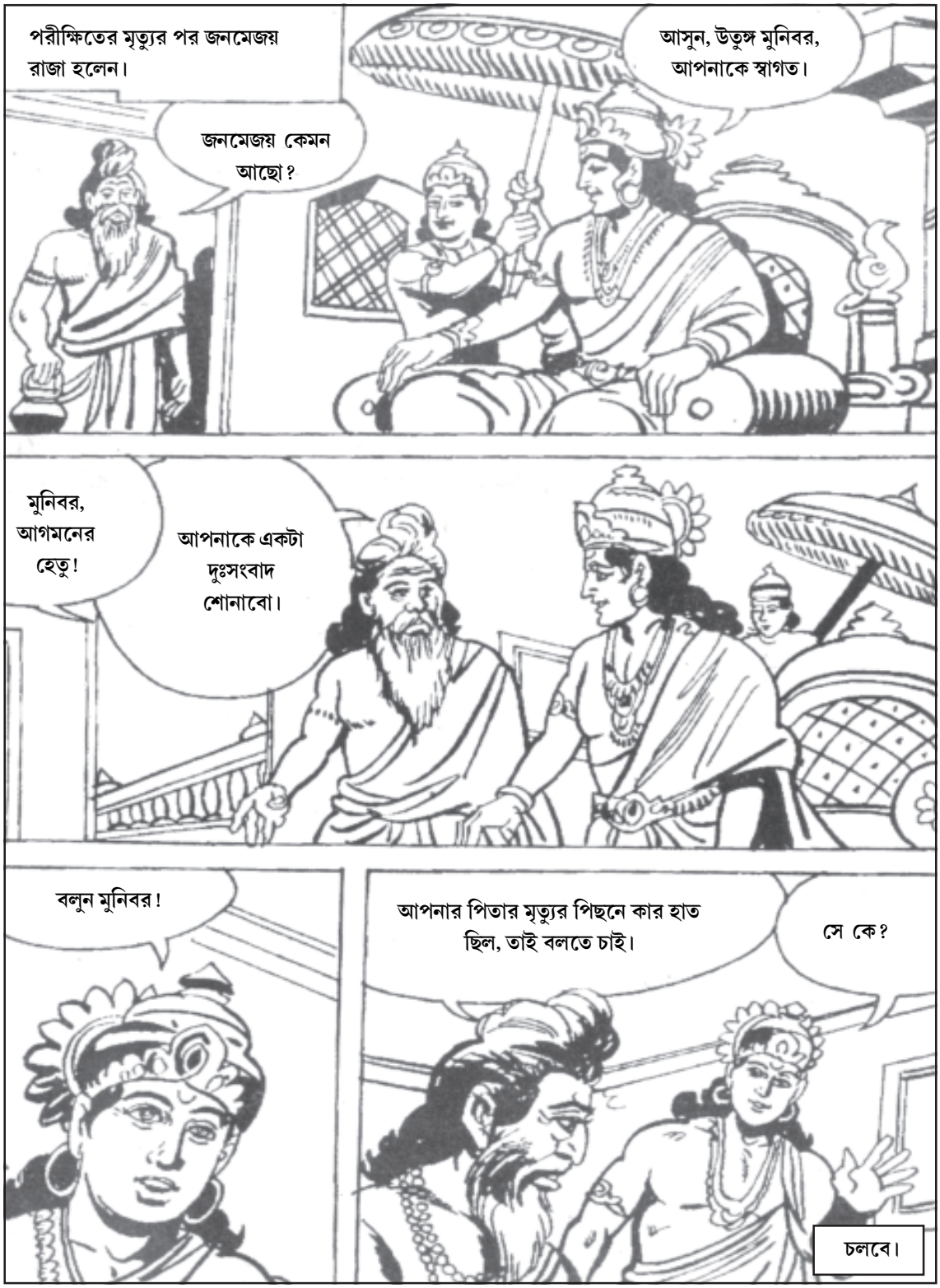

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
26 September - 2011

দাম : ৫.০০ টাকা